# ৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

## আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Section-A
Ch-5
Ch-6

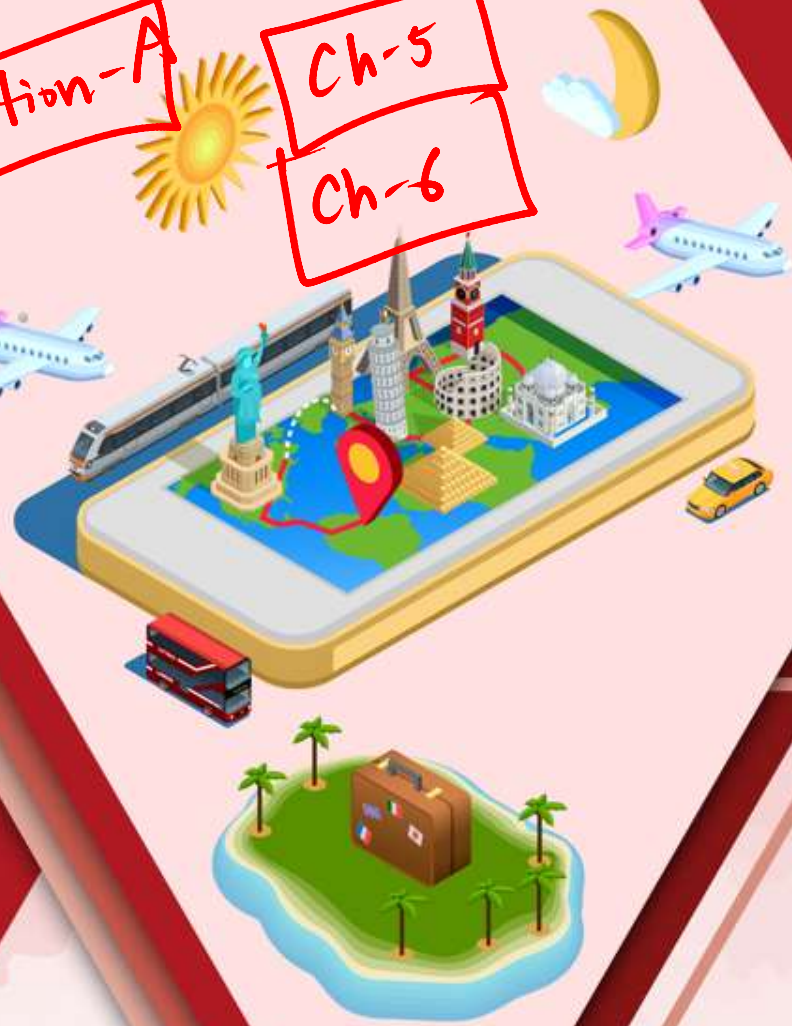

7:15 PM

শুভ যাত্রা

Viva

**লেকচার: ০৩**

**টপিক:**

বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি: বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কূটনীতিকের কার্যাবলি, কূটনীতিকদের অব্যাহতি ও দায়মুক্তি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুক্ত বাণিজ্য, সংরক্ষণবাদ, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ সংকট, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই), আর্থিক উদারীকরণ, আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিকরণ, নর্থ -সাউথ গ্যাপ, বৈশ্বিক দারিদ্র্য, এমডিজি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# পররাষ্ট্রনীতি

- পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে লার্কে ও সৈয়দ বলেন, "The foreign policy of a state usually refers to the general principles by which a state governs its reaction to the international environment." অর্থাৎ, "আন্তর্জাতিক পরিবেশের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র যেসব নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করে, তাকেই বলা হয় সেই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি।"

- Prof. Padelford ও Lincoln বলেন, "Foreign Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interests" অর্থাৎ "পররাষ্ট্রনীতি হলো সেই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার বৃহৎ স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে।"

- Joseph Frankle বলেন, "Foreign policy consists of decisions and actions, which involves to some appreciable extent relations between one state and others" অর্থাৎ "পররাষ্ট্রনীতি হলো সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।"

# পররাষ্ট্রনীতি

## ❖ পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ-

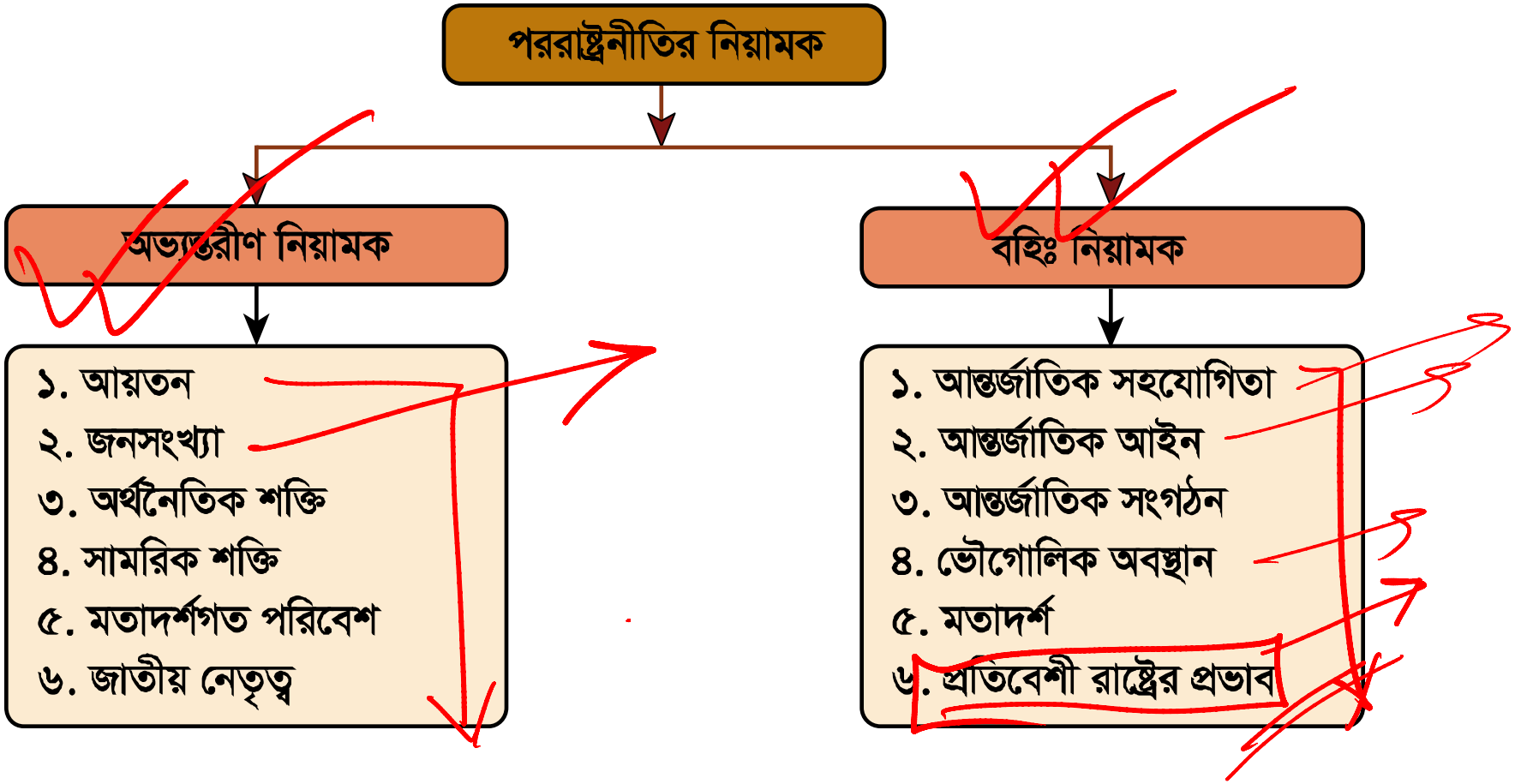

# পররাষ্ট্রনীতি

## উত্তম পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

এবং একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি একেক রকম হলেও একটি বিষয়ে সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। আর তা হলো নিজ দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। প্রতিটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয় নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে। তারপরও বিশ্ব কল্যাণের জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বাড়ানোর জন্য উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়। নিচে উত্তম পররাষ্ট্রনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ✓ নিজ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা।
- ✓ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় যত সমস্যা আছে তার সমাধান করা।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতিতে সবার সাথেই বন্ধুত্ব এবং কারোর সাথেই শত্রুতা নয় এমন নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- ✓ সকলের সাথে মতপার্থক্য দূর করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উত্তম পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতি এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন না ঘটে কারণ মনে রাখতে হবে প্রতিবেশী দেশ যদি অস্থিতিশীল হয় তবে সেই দেশটিও অস্থিতিশীল হবে। তাই নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রতিবেশীর শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন: কোনো কারণে যদি ভারত অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তাহলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো কোনো প্রকার জঙ্গিবাদ যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।
- ✓ প্রত্যেক রাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সব রাষ্ট্রেই এ কাজের জন্য পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো বা ব্যবস্থা রয়েছে। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বর্তমান বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন: আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানকে পাশ কাটিয়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব দেশসমূহ অর্থনীতির চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত। তাই তারা যেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে বলে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয়। বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেউ ছোট করে দেখে না। তাই প্রতিটি দেশই তাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতির ইচ্ছা থাকলেও প্রণয়ন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

- Sir Arnest Stalow এর মতে, "Diplomacy is the application of tact and intelligence by which the states maintain their official relations." অর্থাৎ "কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ।"
- উড্রো উইলসন তাঁর "Fourteen Points" বইয়ে বলেছেন, "কূটনীতি সর্বদা খোলামেলাভাবে ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে অগ্রসর হবে।"
- Harold Nicolson এর মতে, "Diplomacy is guiding international relations through negotiation and the manner in which it manages ambassadors and envoys of these relations and diplomatic working man or his art."
- The Oxford English Dictionary তে কূটনীতি (Diplomacy) এর অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়, "কূটনীতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পরিচালনার ব্যবস্থা।"
- প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln) এর মতে, "কূটনীতি বলতে প্রতিনিধিত্বের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রথাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।"
- মরগ্যানথ্যু (H. G. Morgenthau) এর মতে, "কূটনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মস্তিষ্ক স্বরূপ।" তাঁর মতে, "কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।"
- উড ও সেরেস (J.R. Wood and Jean Serres) এর মতে, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কৌশল হচ্ছে কূটনীতি।"

সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারিভাবে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই বলে কূটনীতি।

# কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

## ❖ পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্যে পার্থক্য-

| পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy) | কূটনীতি (Diplomacy) |
|---|---|
| ১. পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব নীতি, যা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে। | ১. কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ। |
| ২. পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করা | ২. পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করে তোলাই কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য। |
| ৩. প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতি প্রস্তুত করা হয়। | ৩. কূটনীতি কোনো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের মাধ্যম। কূটনীতি উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি পদ্ধতি। |
| ৪. পররাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত। | ৪. কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। |
| ৫. পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে থাকে কোনো দেশের আইনসভা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। | ৫. কূটনীতির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই; কূটনীতিককে পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থেকেই কাজ করতে হয়। |
| ৬. পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু কী রূপ হবে, তা নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ওপর। | ৬. কূটনীতি, প্রণীত পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। |
| ৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কখনো স্থগিত হয়ে যায় না বা পররাষ্ট্রনীতি স্থগিত হয় না। | ৭. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় কূটনৈতিক কার্যাবলি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়। |
| ৮. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কূটনীতিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। | ৮. কূটনীতি ব্যর্থ হলে পররাষ্ট্রনীতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। |
| ৯. সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। | ৯. অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি আবশ্যক। |
| ১০. সংকটকালে পররাষ্ট্রনীতি ভূমিকা মুখ্য নয়। | ১০. কূটনৈতিক কার্যক্রম সংকটকালে চলতে থাকে। |
| ১১. পররাষ্ট্রনীতিকে বলা হয় Vision of State। | ১১. কূটনীতিকে বলা হয় Mission of Foreign Policy। |

## বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ

অর্থনৈতিক কূটনীতি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ বিষয়াবলির সাথে জড়িত। অর্থনৈতিক কূটনীতিবিদগণ বিদেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে নিজ দেশের সরকারকে সেই নীতিসমূহ থেকে কীভাবে সর্বোত্তম উপকার লাভ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ দেশগুলো রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

- **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার:** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক ও বহুমাত্রিক প্রসার কূটনীতিকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা হয়ে থাকে অর্থনীতিই নিয়ন্ত্রণ করছে আধুনিক রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে। বহির্বিশ্বে নিযুক্ত প্রত্যেক দেশের কূটনীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধার। ফলে কূটনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতি পেয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ আসন।
- **মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতি:** মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির কারণে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতি চালু থাকার কারণে বাণিজ্য বিষয়ক সবধরনের বাধা দূরীভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন দেশ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাণিজ্য প্রসারে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক কূটনীতি মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির যুগে বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

# কূটনীতি (Diagram)

- **বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ:** বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট গড়ে উঠেছে। যেমন- WTO, ASEAN, EU, G-7, BRICS প্রভৃতি অর্থনৈতিক জোট উল্লেখযোগ্য। এসব জোট বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর এসব জোটের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ। এরা বিশ্বব্যাপী কূটনীতির মাধ্যমে এসব জোটকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন। তাই অর্থনৈতিক কূটনীতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।
- **নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা:** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পুরোপুরি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্বেও সামরিক শক্তিকে একটি দেশের মর্যাদা ও শক্তির মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে তা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে কোনো দেশের শক্তি ও মর্যাদা নির্ভর করে তার অর্থনীতির উপর। তাই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। আর অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে অর্থনৈতিক কূটনীতি।
- **বাজার দখলের প্রতিযোগিতা:** যেহেতু বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু আছে, সেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বাজার দখলের এক কঠিন প্রতিযোগিতা চলছে। কারণ যে দেশ যত বেশি বাজার দখল করতে পারবে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত বৃদ্ধি পাবে। আর বাজার অনুসন্ধান থেকে শুরু করে বাজারে প্রবেশ করা এবং তারপর সেখানে টিকে থাকা পর্যন্ত সব কাজ করে থাকে অর্থনৈতিক কূটনীতি।

# কূটনীতি (Diplomacy)

- **বহুজাতিক সংস্থার তৎপরতা বৃদ্ধি:** নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় Multinational Company গুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান অংশ। এসব সংস্থা বিভিন্ন দেশে নানারকম অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত রয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এসব সংস্থার কার্যক্রমও ক্রমশ বেড়েই চলছে। তাই বহুজাতিক সংস্থাসমূহ কূটনীতির আওতায় এসে গেছে।

- **পারস্পরিক সহযোগিতার প্রসার:** নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অনেক সম্পদশালী রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে। এই বিদেশি সাহায্যকে কতটুকু নিজেদের জন্য নিয়ে আসতে পারে তা নির্ভর করছে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কূটনীতির সাফল্যের উপর।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## চাপ প্রয়োগের কূটনীতি (Coercive Diplomacy)

অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট হুমকির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মনোভাব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বলা হয় Coercive Diplomacy। ন্যাটো বাহিনী সাবেক যুগোস্লাভিয়ার উপরে কসোভো সংকটের সময় ১৯৯৯ সালে এ ধরনের কূটনীতি অবলম্বন করে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করলেই বুঝা যাবে চাপ প্রয়োগের কূটনীতি কতটা কার্যকর –

উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিত্ররা রাশিয়ার উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে চাপ প্রয়োগ করছে। তারা যেন ইউক্রেন আগ্রাসন থেকে ফিরে আসে।

## সাংস্কৃতিক কূটনীতি (Cultural Diplomacy)

কোনো দেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার জন্য যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়, তাকে বলা হয় Cultural Diplomacy/সাংস্কৃতিক কূটনীতি। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ক্ষেত্রে উক্ত পরিভাষা দ্বারা প্রাথমিকভাবে বহির্বিশ্বে তাদের ভাষাকে লালন ও বিকাশ সাধনে সহায়তা বুঝায়। মিশনে কর্মরত কালচারাল এ্যাটাশেরা এ ধরনের দায়িত্ব পালন করেন। বৃটিশ কাউন্সিল, গ্যাটে ইনস্টিটিউট, আমেরিকান/রাশিয়ান/ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এ ধরনের তৎপরতায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব অফিস ও গ্রন্থাগার। স্ব স্ব দেশের সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্যকে তুলে ধরাও উহার অন্যতম কাজ। সাংস্কৃতিক কূটনীতি দু'দেশের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঘটাতে প্রয়াস পায়। যেমন: দেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সংযোগ কর্মসূচি (Link Programme)। এছাড়াও সাংস্কৃতিক কূটনীতির অংশ হিসেবেই বাংলাদেশ তার বিভিন্ন দূতাবাসে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## চেকবুক ডিপ্লোমেসি (Checkbook Diplomacy)

সাধারণত উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিনিয়োগ করে নিজের বলয়ে নিয়ে আসার নামই চেকবুক কূটনীতি। বর্তমানে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে কোনো দেশকে কাছে টানতে চাওয়ার কূটনীতিই হলো চেকবুক কূটনীতি। এই কূটনীতি ধারণার উদ্ভব হয়েছে মূলত চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করাকে লক্ষ্য করেই চেকবুক কূটনীতির মাধ্যমে চীন তার কৌশলগত ও সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করছে। এ কূটনীতিকে আবার Debt Trap Diplomacy বলা হয়।

**উদাহরণ:**

- ✓ ২০১৭ সালের চীন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরে (CPEC) চীন ৬২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। চীনের কাছে একটি বন্দর হস্তান্তর করছে ইসলামাবাদ। একটি নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ভূমি সমর্পণ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে শ্রীলঙ্কাকে ৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে চীন। পাকিস্তানের মতোই শ্রীলঙ্কা তার হাম্বানটোটা বন্দরকে চীনের নিকট ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## ডলার কূটনীতি (Dollar Diplomacy)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি দিক হলো ডলার কূটনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসা বাণিজ্য, তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী', 'অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন', 'কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা' ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে। কার্যত এই ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে মার্কিন পণ্যের একচেটিয়া বাজার বজায় রাখার প্রয়াস চালানো হয় এবং ঋণ বা সাহায্যগ্রহীতা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করা হয়। আর এটিই Dollar Diplomacy বা ডলার কূটনীতি নামে পরিচিত। অনেক অর্থনীতি বিশ্লেষক Dollar Diplomacy ও Checkbook Diplomacy কে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

## গণতান্ত্রিক কূটনীতি (Democratic Diplomacy)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গণতান্ত্রিক কূটনীতির সাধারণ ব্যবহার শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ এ সময় থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমতের প্রাধান্য দেয়া হয়। জনগণ ক্রমাগতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উৎসাহী হয়ে পড়ে। ফলে পররাষ্ট্র এবং কূটনৈতিক ব্যাপারে তারা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং কূটনৈতিক চিন্তাধারায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, দায়বদ্ধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করার তাগিদ দেয়। আর এ ধরনের কূটনীতিকেই গণতান্ত্রিক কূটনীতি বলা হয়।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## গানবোট কূটনীতি (Gunboat Diplomacy)

সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরী দেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশলকেই সাধারণত বলা হয় গানবোট কূটনীতি। এটি মূলত সমুদ্রপথে সংশ্লিষ্ট দেশটির সীমানার আশেপাশে বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর পাঠিয়ে চাপে রাখার একটি কৌশল। মূলত দুর্বল ও ছোট দেশগুলোর বিপরীতে এ ধরনের সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও আগ্রাসন সম্ভব। উনিশ ও বিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক সামরিক শক্তিধর দেশ এই ধরনের আচরণের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছে। নৌপথে যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হাইতি, পানামা, কলম্বিয়া এবং নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে এই গানবোট কূটনীতি ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি শীতল যুদ্ধের সময়েও দেশটি লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের বিপক্ষে এ ধরনের আগ্রাসন প্রদর্শন করেছিল। তাছাড়া, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৭ম নৌবহর প্রেরণ করতে চেয়েছিল যা গানবোট কূটনীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু রাশিয়ার হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## পিং পং কূটনীতি (Ping Pong Diplomacy)

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি টেবিল টেনিস দল জাপানের নাগোয়াতে ৩১তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ সময় মার্কিন টেবিল টেনিস দলকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারা চীন সফর করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল চৌ এন লাই উক্ত দলকে আপ্যায়ন করেন এবং বলেন "You opened a new phase of relation between PRC and US."

চীনা ভাষায় টেবিল টেনিস খেলাকে বলা হয় "পিং পং"। এ সফরের মধ্য দিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঐতিহাসিক চীন সফরের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ কূটনৈতিক উদ্যোগই পিং পং কূটনীতি নামে পরিচিতি লাভ করে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## নিবর্তক কূটনীতি (Preventive Diplomacy)

নিবর্তক কূটনীতি হলো এমন কূটনীতি যাতে এর মাধ্যমে কোনো বিবাদমান অবস্থা সংঘর্ষের দিকে না যেতে পারে সে বিষয়ে কাজ করা হয়। এই কূটনীতি বিবাদমান অবস্থাকে একটি সীমার মধ্যে রাখে। অস্ত্র সংঘর্ষে যাওয়ার আগেই এই কূটনীতির মাধ্যমে সংকট সমাধান করা হয়। যেমন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য চীন ও তুরস্কের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো এক ধরনের নিবর্তক কূটনীতি।

জাতিসংঘের সনদের ৩৩ অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলা হয়েছে এবং বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা ও নিয়ম কানুন দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে যে 'Agenda for Peace' এর কথা বলেন যেখানে প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা:

- ✓ প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতি দুটো দলের মধ্যে বিবাদমান বিতর্কিত অবস্থা থেকে সুরক্ষা দিতে কাজ করবে।
- ✓ বর্তমানে যে বিতর্ক বা বিবাদ রয়েছে তা যেন সংঘর্ষের দিকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।
- ✓ পক্ষ দুটি যদি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা যেন সীমিত আকারে হয় প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির মাধ্যমে সে চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বশান্তির জন্য এই 'Agenda for Peace' বিখ্যাত দলিল হিসেবে বিবেচিত।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির কতগুলো উল্লেখযোগ্য দিক-

- ✓ ব্যাপক সংঘর্ষ এবং হুমকি প্রতিরোধ করা।
- ✓ কোনো সংঘাত যাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- ✓ আক্রমণ বা সহিংসতার ইচ্ছাকে সীমিত করা।
- ✓ স্বেচ্ছা কার্যক্রমের দ্বারা এ ধরনের কূটনীতি করা হয়, কোনো দেশের উপর সমাধান চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যেমন – ভারত-পাকিস্তান সংকটের ক্ষেত্রে তাদেরকে স্বেচ্ছায় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে, কোনো দেশ এক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি বা জোর প্রয়োগ করতে পারবে না।
- ✓ এ ধরনের কূটনীতির মাধ্যমে আস্থা বিশ্বাস স্থাপিত হয়।
- ✓ এ কূটনীতি হস্তক্ষেপ না করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো রাষ্ট্র যাতে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করতে না পারে।
- ✓ কীভাবে সামনের দিকে যেতে হবে তার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে।
- ✓ সরকার বা ক্ষমতায় আছেন এমন কেউ প্রাথমিকভাবে কাজ করবে। পরিশেষে, সরকার সে কাজের অনুসমর্থন বা স্বীকৃতি দিবে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## শাটল কূটনীতি (Shuttle diplomacy)

যখন কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বারবার সফর করেন, তখন তাকে Shuttle diplomacy বলে। যেমন- মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধের জন্য বারবার ইসরাইল ও মিশর সফর করেন। এ সময় তিনি মিশর ও সিরিয়া এলাকা থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের চেষ্টা চালান। New York Times ১৯৭৪ সালে এ ধরনের সফরের ক্ষেত্রে Shuttle শব্দ প্রথম ব্যবহার করে। তখন থেকে এই ধরনের তৎপরতাকে Shuttle diplomacy বলে। সম্প্রতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাপান, চীন ও ভারত সফরের মাধ্যমে 'Shuttle diplomacy' এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তুরস্ক বারবার মস্কো ও কিয়েভ ভ্রমণ করে যা Shuttle diplomacy এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## সাইডলাইন কূটনীতি (Sideline Diplomacy)

আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনের ফাঁকে যদি দ্বিপাক্ষিক কোনো বিষয়ে নিয়ে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হয় বা সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তাকে সাইডলাইন কূটনীতি বলে। যেমন- জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। সেখানে নাগরিক পঞ্জি (NRC) নিয়ে আলোচনা করেন। নরেন্দ্র মোদি NRC নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করেন। এটি Sideline Diplomacy এর একটি উদাহরণ।

# কূটনীতি (Diplomacy)

**কূটনীতির বিভিন্ন স্তর :** কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রয়েছে- ট্র্যাক-১ কূটনীতি, ট্র্যাক-২ কূটনীতি, ট্র্যাক-৩ কূটনীতি, দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি ও মাল্টি ট্র্যাক কূটনীতি।

| | |
|---|---|
| **ট্র্যাক-১ কূটনীতি (Track-I Diplomacy)** | Track-I কূটনীতি বলতে বোঝায় গতানুগতিক সরকারি কূটনীতি। এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা অন্যদেশের সরকারি কর্মকর্তাগণের সাথে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় সেটাই Track-I কূটনীতি।<br>উদাহরণ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মাঝে কূটনৈতিক আলোচনা। |
| **ট্র্যাক-২ কূটনীতি (Track-II Diplomacy)** | Track-I কূটনীতি ব্যর্থ হলে সরকারের পাশাপাশি বিবাদ মিটাতে সুশীল সমাজ, যেমন: মিডিয়া, চার্চ বা ধর্মীয় গোষ্ঠী, মহিলা সংগঠন, শিক্ষা সংগঠন ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় Track-II Diplomacy। সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ মূলত আস্থা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করে। একে Back Channel Diplomacyও বলা হয়। |

# কূটনীতি (Diplomacy)

| | |
|---|---|
| **ট্র্যাক-৩ কূটনীতি (Track-III Diplomacy)** | দুইটি পক্ষের বিবাদ মীমাংসায় তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি আলোচনায় অংশ নেয় তখন তা Track-III কূটনীতি হয়। দাতা গোষ্ঠীসমূহ যেমন: বিশ্বব্যাংক, ADB, JICA, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা যখন বিরাজমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসনে আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে উদ্যোগ নেয়, তখন তাকে বলা হয় Track-III Diplomacy.<br>উদাহরণ: ADB ব্যাংক এর বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। |
| **দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি (Dual Track Diplomacy)** | প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনার পাশাপাশি সামরিক মহড়ার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনই (Dual Track Diplomacy) দ্বৈত কূটনীতি। ২০১২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে (Dual Track Strategy) দ্বৈত কৌশল গ্রহণ করেন এবং এই কৌশলে সফলতাও আসে ২০১৫ সালে। ইরানের সাথে আলোচনা এবং একইসাথে পারস্য উপসাগরে মার্কিন ৫ম নৌবহরের (মিনা সলোমন) সামরিক সাজসজ্জার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন ছিল দ্বৈত কৌশল। যা পরবর্তীতে Dual Track Diplomacy হিসেবে পরিচিতি পায়। ২০১৫ সালে এরূপ কূটনীতির মাধ্যমে ইরানের সাথে ১০ বছর মেয়াদি পরমাণু সমঝোতার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল Joint Comprehensive Plan of Action. |
| **বহুমাত্রিক কূটনীতি (Multi-Track Diplomacy)** | বিভিন্নমুখী কূটনৈতিক উদ্যোগকে (Track - I, II, III) যখন বিভিন্ন ট্র্যাকে একই সাথে চালিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকে Multi Track কূটনীতি বলা হয়। উদাহরণ: ধরা যাক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন। একই সাথে বাংলাদেশের ড. রেহমান সোবহান ও ভারতের অভিজিৎ ব্যানার্জি যদি একই বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকেন সেটাই হবে Multi Track কূটনীতি। |

# কূটনীতি (Diplomacy)

## টিকা কূটনীতি (Vaccine Diplomacy)

কূটনীতি বলতে বুঝানো হয় এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ। এই সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ভ্যাক্সিন বা টিকার ব্যবহারকে ভ্যাক্সিন ডিপ্লোমেসি বা টিকা কূটনীতি বলা হচ্ছে। টিকা কূটনীতি দ্বারা শুধু অর্থায়ন নয় বরং টিকা উদ্ভাবন, বাণিজ্যিকভাবে বিনিময়, সরবরাহের জন্য কৌশলগত যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়কেও বুঝানো হচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ জার্নালে ২০১৪ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে পিটার জে হটেজ বলেন ভ্যাক্সিন কূটনীতির প্রথম সফল প্রয়োগ হয় উনিশ শতকের শুরুতে। ১৮০০ সাল থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে গুটিবসন্তের টিকা তৈরির মাধ্যমে এ কূটনীতির সূত্রপাত। হটেজ মনে করেন টিকা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর হাতিয়ার। কোভিড মহামারিকে কেন্দ্র করে ৭টি ভ্যাক্সিন বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ভ্যাক্সিনগুলোর মধ্যে কোন দেশ আগে কোন ভ্যাক্সিনটি পাবে এই নিয়ে শুরু হয় টিকা কূটনীতি। যার ফলে সৃষ্টি হয় টিকা বৈষম্য। জাতিসংঘের মতে, এই বৈষম্য বেড়েই চলেছে। টিকা উদ্ভাবনের সময় থেকেই উন্নত রাষ্ট্রগুলো প্রি অর্ডারের মাধ্যমে আগে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মাই নেশন ফার্স্ট' নীতি মেনে উন্নত রাষ্ট্রগুলো বিশ্বব্যাপী টিকা কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

ভ্যাক্সিন নিয়ে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ/বৈষম্য এর আগে পরিলক্ষিত হয় ২০০৭ সালে। H5N1 ভাইরাসে ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধনী দেশগুলো টিকা কিনে নেয়ায় ইন্দোনেশিয়ায় শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিক টিকা নিরাপত্তায় কোভ্যাক্স কিছুটা আশার আলো দেখালেও ধনী ও শিল্পোন্নত দেশের টিকা কূটনীতির কাছে নিম্ন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি (Wolf Warrior Diplomacy)

বর্তমান সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে চীন কাউকে তোয়াক্কা করছে না। সাম্প্রতিক সময়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে চীনের মূখপাত্ররা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর, বেশি আক্রমণাত্মক এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও অনেক বেশি সক্রিয়। চীনের এরকম মনোভাবকে অনেকে নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নেকড়ে যেমন তার শত্রুকে কখনো ছাড় দেয় না তেমনি চীনের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের যেকোনো তীর্যক মন্তব্যের বিপরীতে চীনও এখন পাল্টা আক্রমণ হিসাবে তীর্যক মন্তব্য ছুড়ছে, কোনো রকম ছাড় দিচ্ছে না কাউকে। চীনের এ আক্রমণাত্মক জবাবকে নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি বা Wolf Warrior Diplomacy বলা হয়।

যেমন: ৩ আগস্ট, ২০২২ ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফরে আসলে চীন হুশিয়ারি দিয়ে বলে "চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা চীন কোনো ভাবেই মেনে নিবে না"।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## কূটনৈতিক মিশন/ কূটনীতিকের কাজ

Vienna Convention on Diplomatic Relation-1961 এর অনুচ্ছেদ-৩ অনুসারে একজন কূটনীতিক/কূটনৈতিক মিশন যে কাজগুলো করে থাকে –

অনুচ্ছেদ -৩ (১) গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা।

অনুচ্ছেদ -৩ (২) আন্তর্জাতিক আইন মেনে গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

অনুচ্ছেদ -৩ (৩) গৃহীত রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালানো।

অনুচ্ছেদ -৩ (৪) গৃহীত রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে প্রেরিত রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা।

অনুচ্ছেদ -৩ (৫) গৃহীত রাষ্ট্রের সাথে প্রেরিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো।

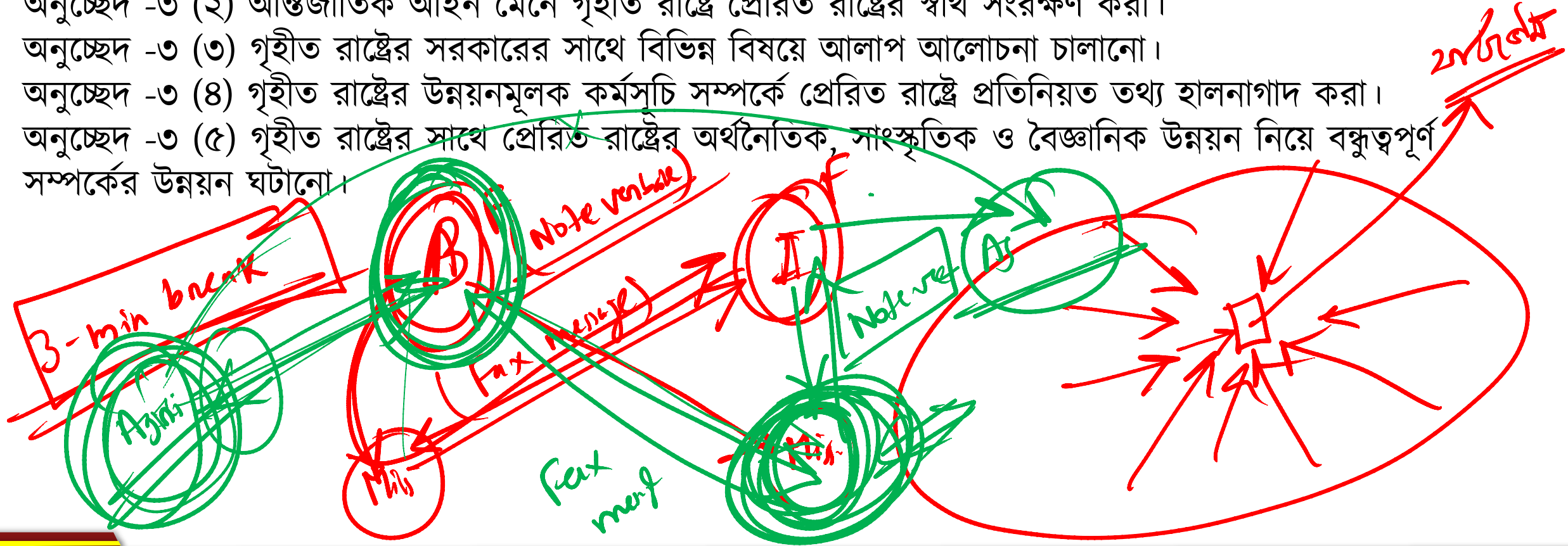

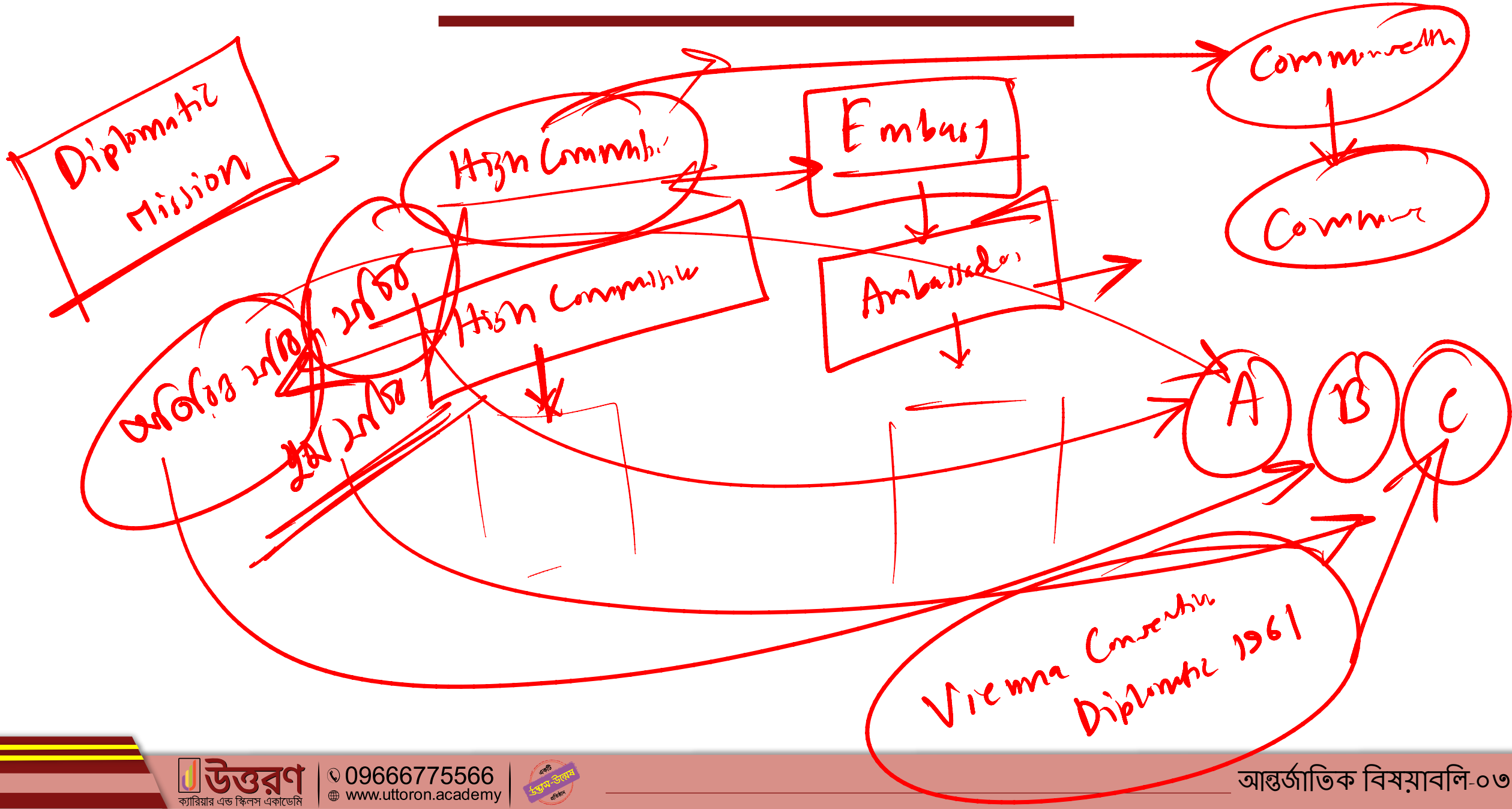

Diplomatic Mission
High Commission
Embassy
Ambassador
High Commission
A
B
C
Vienna Convention Diplomatic 1961

# কূটনীতি (Diplomacy)

## কূটনীতিক সুবিধা ও দায়মুক্তি

১৮ এপ্রিল, ১৯৬১ স্বাক্ষরিত ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন এর ৩১-৩৪ অনুচ্ছেদে কূটনৈতিকদের অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অধিকার বা দায়মুক্তিগুলো হলো –

- ✓ একজন কূটনৈতিক স্বাগতিক দেশে সেদেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিকের মতো প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের রাজস্ব ও মিউনিসিপ্যাল কর থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ কূটনৈতিক মিশনের নথিপত্র তল্লাশি বা আটক করা যাবে না।
- ✓ কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বাগতিক দেশে নিজের ও পরিবারবর্গের জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবেন।
- ✓ কূটনৈতিককে স্বাগতিক দেশ গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে না। স্বাগতিক দেশ যথাযথ সম্মান সহকারে কূটনীতিকের সাথে আচরণ করবে এবং তাঁর দেহ, স্বাধীনতা বা মর্যাদার ওপর যে কোনো আক্রমণ রোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ✓ কূটনীতিকের বাসস্থান কূটনৈতিক মিশনের মতোই যথাযথভাবে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত হবে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## কূটনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা

### হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডর

হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডর হলো একটি দেশ কর্তৃক অন্য একটি দেশে প্রেরিত প্রবীণ কূটনীতিক বা রাষ্ট্রদূত। কমনওয়েলথভুক্ত একটি দেশ অন্য একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশে যে কূটনীতিক প্রেরণ করে, তাকে বলা হয় হাইকমিশন। হাই কমিশনের প্রধান কর্তা ব্যক্তি বা কূটনীতিককে বলা হয় হাইকমিশনার। পক্ষান্তরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক সংগঠনে কোনো কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করা হলে বলা হয় অ্যাম্বাসি (embassy)। অ্যাম্বাসির প্রধান ব্যক্তি বা প্রধান কূটনীতিককে বলা হয় অ্যাম্বাসেডর। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে বা জাতিসংঘে বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রধানকে বলা হয় অ্যাম্বাসেডর বা রাষ্ট্রদূত এবং যুক্তরাজ্যে বা ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রধানকে বলা হয় হাইকমিশনার।

### Persona non grata

Persona non grata একটি ল্যাটিন ভাষা যার আক্ষরিক অর্থ অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কূটনীতিতে Persona non grata বলতে এমন বহির্দেশীয় ব্যক্তিকে বোঝায় যার নির্দিষ্ট কোনো একটি রাষ্ট্রে অবস্থান ও প্রবেশ ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্ষেপে পার্সোনা নন গ্রাটা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তি অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত হলেই ঐ দেশ থেকে প্রত্যাহারযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## Attache

অ্যাটাশে সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত, নৌ, সামরিক, বিমান কিংবা বাণিজ্যিক অ্যাটাশে। এরা সাধারণত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হয়ে থাকেন এবং মিশনে কাজ করেন বিশেষজ্ঞ হিসেবে অর্থাৎ তাঁদের কাজ বিশেষায়িত।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অ্যাটাশে: তাঁরা কূটনৈতিক সচিবদের একেবারে নিম্নস্তরের সার্ভিসের স্থায়ী সদস্য। এই পদ বর্তমানে বিলোপ করা হয়েছে। এদের এখন বলা হয় থার্ড সেক্রেটারি।

তৃতীয়ত, কালচারাল অ্যাটাশে: কালচারাল অ্যাটাশে হলো একজন কূটনীতিক যিনি বিভিন্ন দায়িত্বের সাথে সংযুক্তির প্রেরিত অবস্থার উপর নির্ভর করে। ঐতিহাসিকভাবে, এই ধরনের পদগুলো লেখক এবং শিল্পীদের দ্বারা পূরণ করা হতো। এরা অবৈতনিক/স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতো।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাত থেকে দূরে রাখার মনরো ডকট্রিন

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মার্কিন স্বার্থে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল তাই মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল মার্কিনিরা নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে অন্যকোনো রাষ্ট্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং অন্যকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা ইউরোপের কোনো প্রকার রাজনীতিতে অংশ নেবে না। অর্থাৎ মনরো নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এ কারণে মনরো ডকট্রিনকে Policy of Isolation বা বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি বলে অভিহিত করা হয়।

## যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার নীতি থেকে বের হয়ে আসতে ট্রুম্যান ডকট্রিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য হ্রাস এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব রোধ করতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো নিয়ে NATO (1949) গঠন করে। হ্যারি. এস. ট্রুম্যান কমিউনিজম প্রতিরোধে মধ্যপ্রাচ্যে CENTO জোট এবং দক্ষিণ এশিয়ায় SEATO জোট গঠন করেছিলেন, ট্রুম্যানের এইসব নীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর ট্রুম্যানের এই পররাষ্ট্রনীতিই ইতিহাসে, ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে পরিচিত।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল প্লান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা ও ভূমিকা মার্শাল প্লান (European Recovery Program) নামে পরিচিত। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ মার্শাল এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত মার্শাল প্লান ঘোষণা করেন। মার্শাল বলেছিলেন, "It is logical that The United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world without which there can be no political stability and no assured peace." তিনি আরো বলেছিলেন যে, "যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না"। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি। ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল প্ল্যান। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Plan is not withstanding its apparent novelty only a repetition of the Truman plan for political pressure with the help of dollars." ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৪ বছর এই পরিকল্পনা কার্যকর থাকে। মার্শাল প্ল্যানের অধীনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাভ করে ইংল্যান্ড (২৬%) এর পরে ফ্রান্স (১৮%) ও তৃতীয় অবস্থানে পশ্চিম জার্মানি (১১%)।

## দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য ডমিনো থিওরি

ডমিনো থিওরি ১৯৫০'র দশক থেকে ১৯৮০'র দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেভিড আইজেনহাওয়ার এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। ডমিনো তত্ত্বের মূলকথা ছিল, কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে। স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মনে করত যে Domino Effect বা Chain Reaction তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অঞ্চলের কোনো একটি দেশ সমাজতন্ত্রের অধীনে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও সমাজতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। [বি:দ্র: ডমিনো হলো একটি খেলার নাম, খেলাটি অনেকটা কার্ড খেলার মতো। তবে কার্ডের পরিবর্তে এখানে চতুষ্কোণ আকৃতির কিছু টাইল ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় ডমিনো] এই তত্ত্বের প্রভাবেই ASEAN গঠন করা হয়েছিল, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীনের প্রভাব মুক্ত রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংস্কারে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ কর্তৃক গৃহীত একটি রাজনৈতিক সংস্কার নীতি হচ্ছে গ্লাসনস্ত। গ্লাসনস্ত অর্থ হলো 'খোলামেলা আলোচনা'। অর্থাৎ এই নীতি গ্রহণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে মুক্ত আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। এই নীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক দল ও নীতিতে পরিবর্তন আসে এবং নির্বাচনের মতো গণতান্ত্রিক প্রথা চালু হয়। অপরদিকে পেরেস্ত্রৈকা হলো আশির দশকে (১৯৮৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি। পেরেস্ত্রৈকা শব্দের অর্থ 'পুনর্গঠন'। এই নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কিছুটা উন্মুক্ত করা হয়; বিদেশি বিনিয়োগ, জয়েন্টভেঞ্চার, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রণে শিথিল ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা। অনেকে মনে করে, সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পিছনে এই নীতিগুলো ভূমিকা রাখে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## চুক্তি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য, যা একটি কিংবা দুই বা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ, তাকে চুক্তি বলে।

## চুক্তির প্রয়োজনীয়তা

- চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- চুক্তি zero-sum-game-এর পরিবর্তে win-win game-এর পরিবেশ তৈরি করে।
- চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি নৈপুণ্য ইত্যাদি বিনিময় হয়, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বিত ও টেকসই সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন হয়।
- চুক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চুক্তি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুধু partnership সৃষ্টি করে না, benefit and risk ভাগাভাগির দ্বার উন্মোচন করে।
- চুক্তি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Potentiality of conflict-এর পরিবর্তে Potentiality of cooperation-এর ক্ষেত্র তৈরি করে।

# কূটনীতি (Diplomacy)

## চুক্তির প্রকারভেদ

**Treaty:** Treaty সাধারণত পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক এবং সাধারণত সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

**Convention:** Convention সাধারণত বহুপাক্ষিক চুক্তি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক। সাধারণত Convention সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

**Agreement:** Treaty বা convention-এর চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পাদিত হয় এবং সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় না। Treaty ও Convention-এর তুলনায় কমসংখ্যক পক্ষ এবং সীমিত পরিধির চুক্তির ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহৃত হয়। সরকারের বিভিন্ন Ministry বা Division-এর প্রধান এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক চরিত্রের Agreement -এর ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

# কূটনীতি (Diplomacy)

**Protocol: Protocol ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:**

ক. রাষ্ট্রাচার অর্থে (State behavior);

খ. পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে

গ. যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaty, Agreement) খসড়া অর্থে;

ঘ. মূল চুক্তির কোনো Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ চুক্তির অধীনে সম্পাদিত সম্পূরক বা পরিপূরক চুক্তি অর্থে।

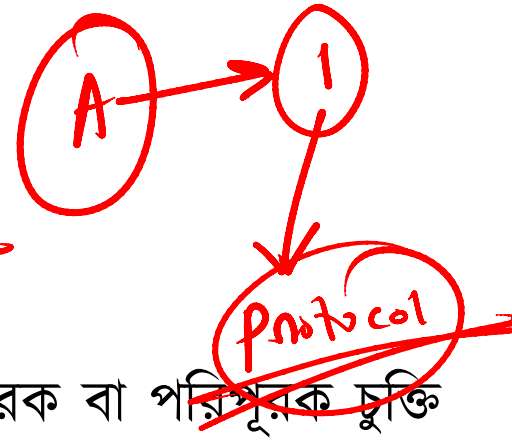


মূলত, Protocol-Treaty, Agreement বা Convention-এর অতিরিক্ত অংশ। Head of the ministry or division-প্রধান এবং Attached department-এর ক্ষেত্রে Department-প্রধান কর্তৃক কম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

# কূটনীতি (Diplomacy)

**MOU:** MOU-হলো Less informal ঐকমত্য। অনেকটা Non-binding প্রকৃতির। Head of the ministry or Head of the division কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। MOU যদি কারিগরি বা প্রশাসনিক প্রকৃতির হয়, সে ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এদের মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। একে আবার Gentalmen's Agreement বলা হয়।

- **Alfred T. Mahan- এর ভাষায়–** "Self interest is not only legitimate but a fundamental cause for foreign policy. It is vain to expect govt. to act continuously on any other ground than national interest."

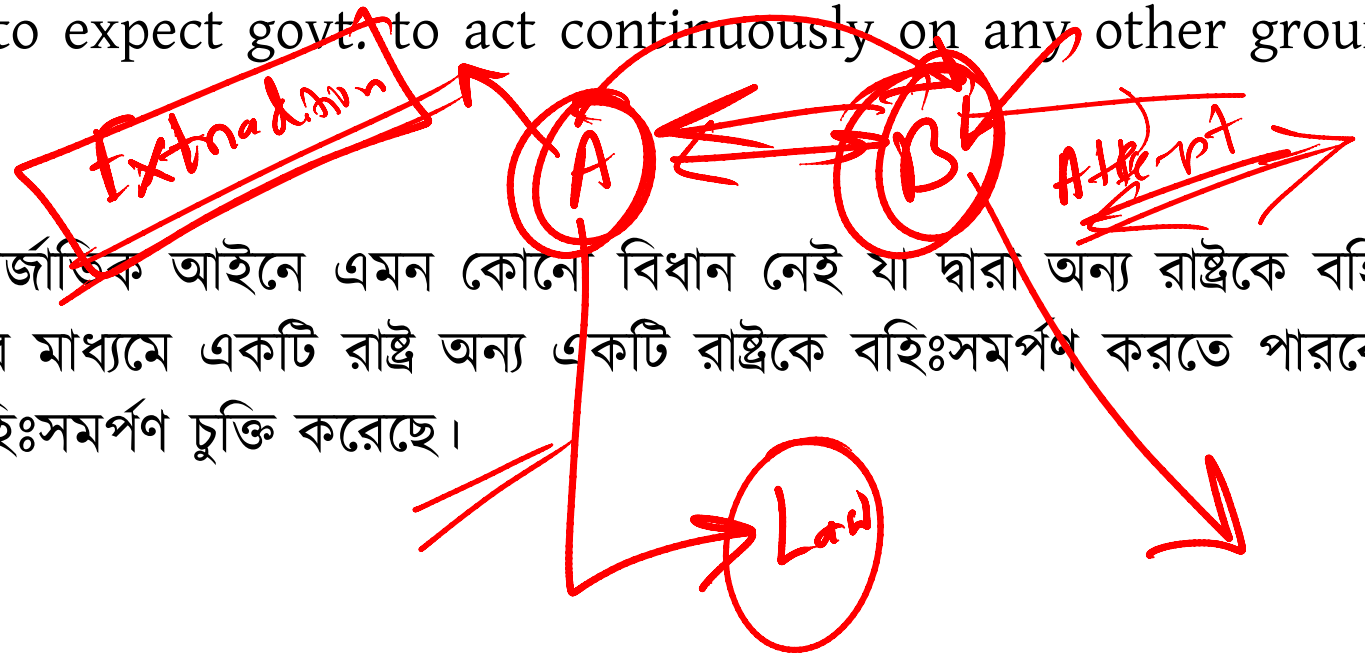


**বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) :** আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোনো বিধান নেই যা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। তবে বহিঃসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে বহিঃসমর্পণ চুক্তি করেছে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## মুক্তবাজার অর্থনীতি

মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Open Market Economy'। 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' এমন এক ধরনের বাজার ব্যবস্থা যেখানে সরকারি সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটাকে কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশেষ অধিকার রক্ষিত হয়।

৮০'র দশক থেকে মূলত বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ এর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ৯০'র দশকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পতন তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে।

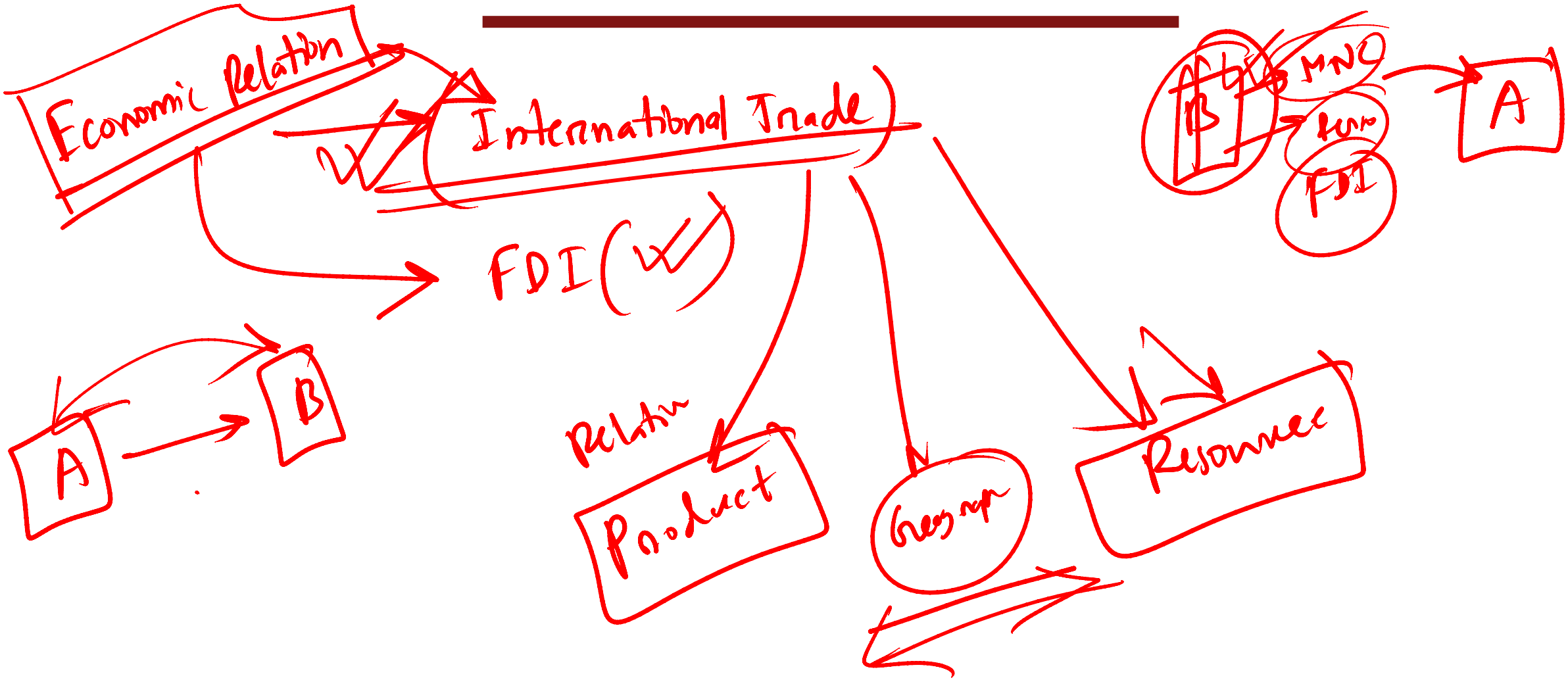

Economic Relation
International Trade
FDI
A
B
MNC
FDI
A
Product

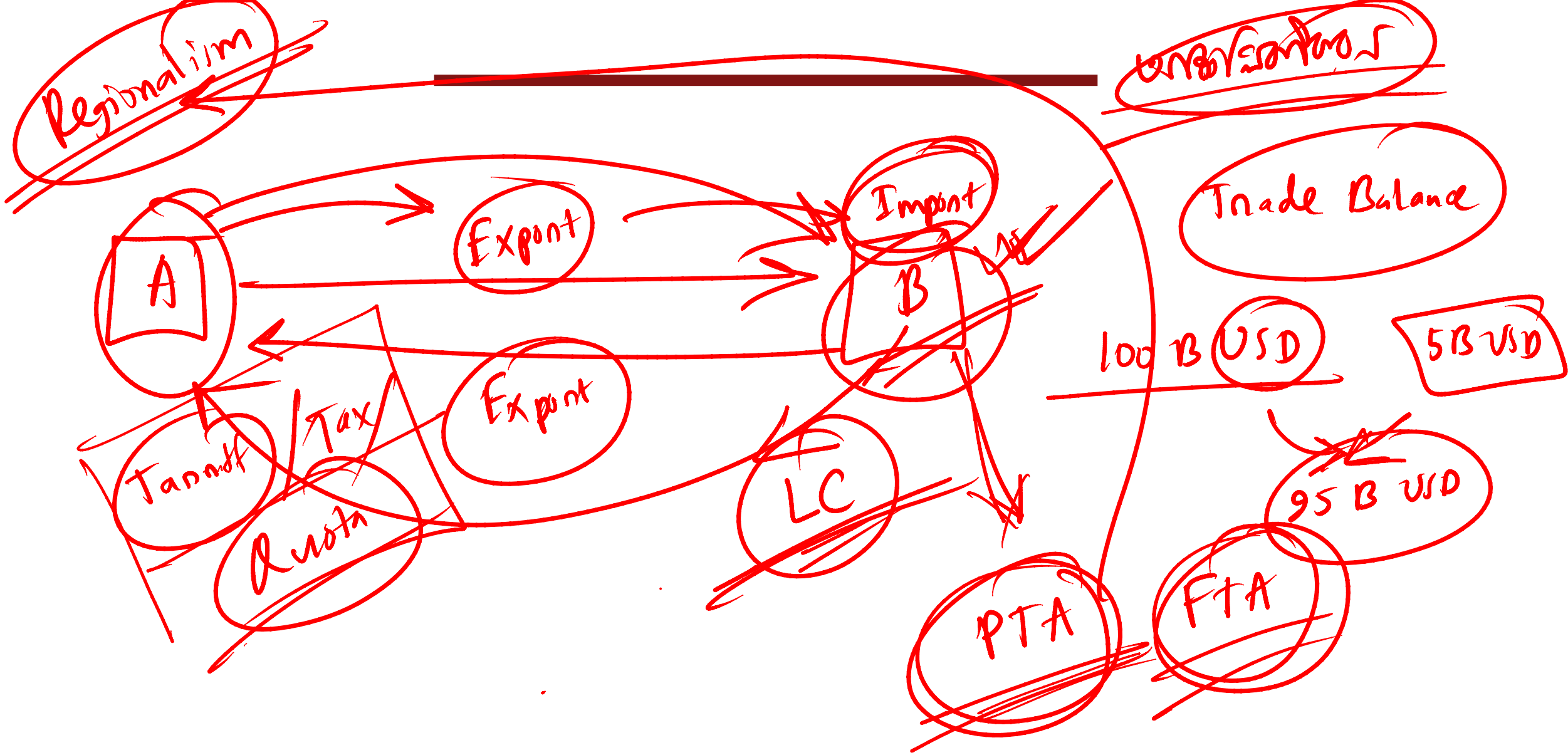

Regionalism
A
Export
Import
B
Export
Tariff
Tax
Quota
LC
PTA
FTA
Trade Balance
100 B USD
5B USD
95 B USD

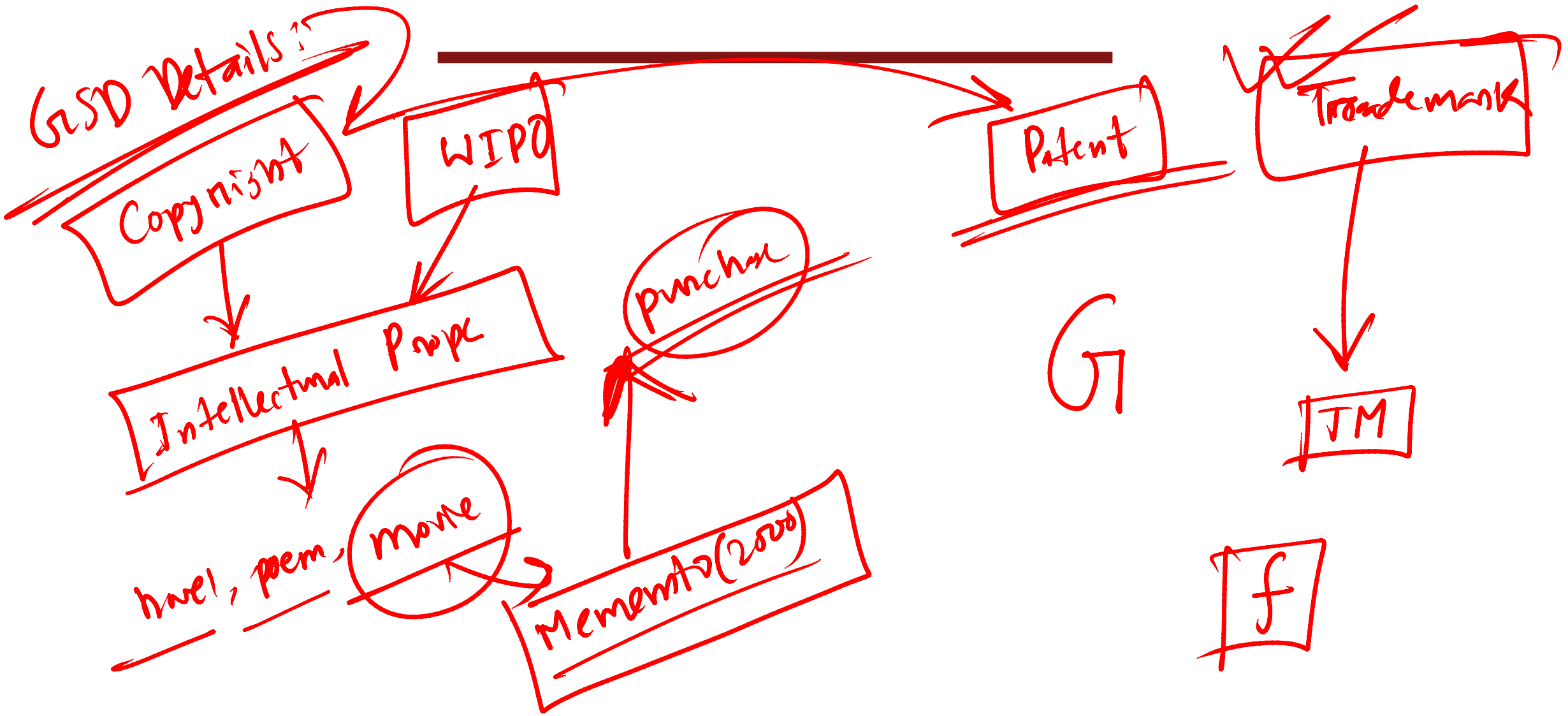

GSD Details?
Copyright
WIPO
Intellectual Prope
novel, poem, movie
Memento (2000)
purchase
Patent
Trademark
G
TM
f

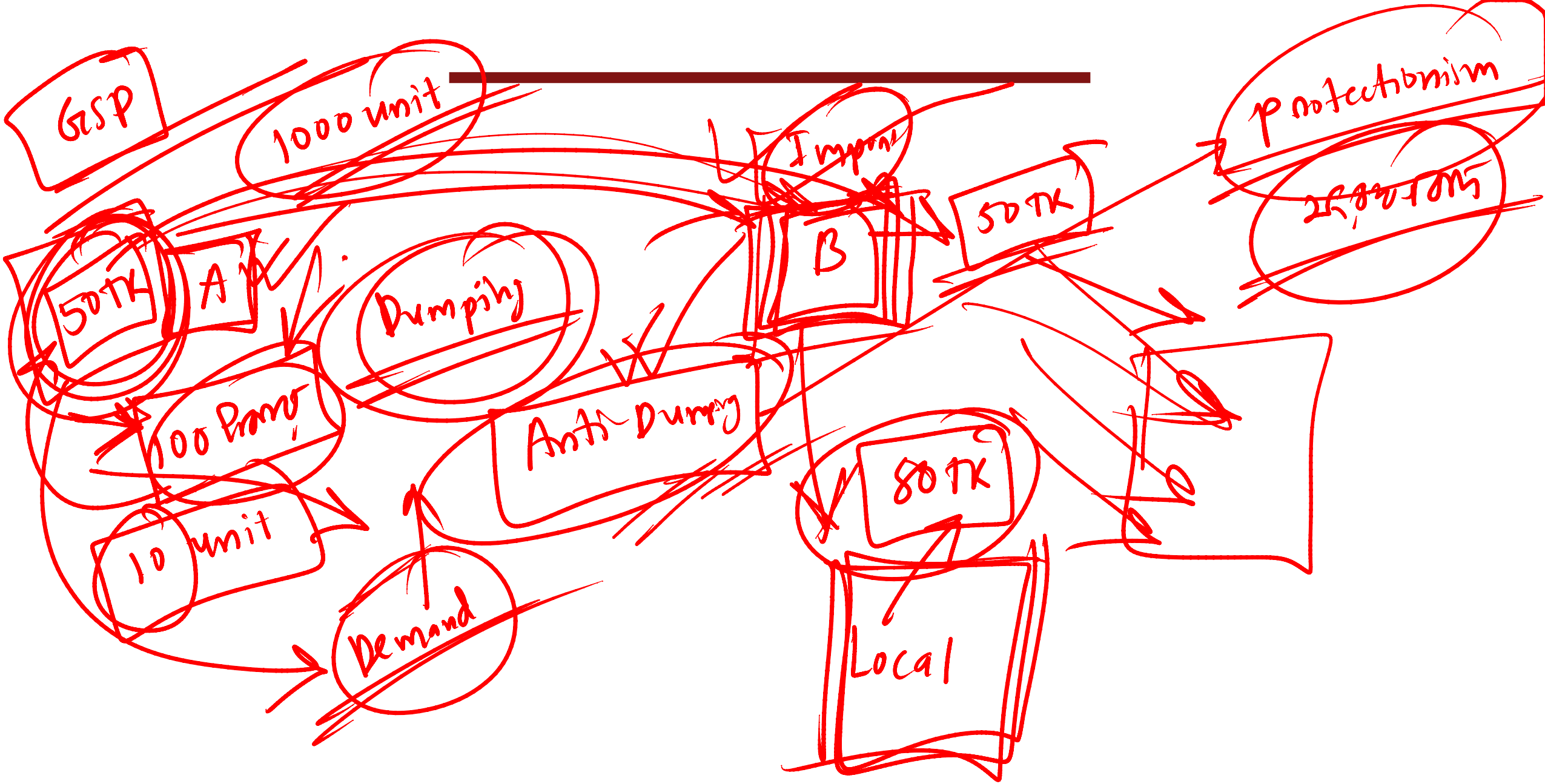

GSP
1000 unit
Import
Protectionism
50TK
A
Dumping
B
50TK
Anti Dumping
10 unit
80TK
Demand
Local

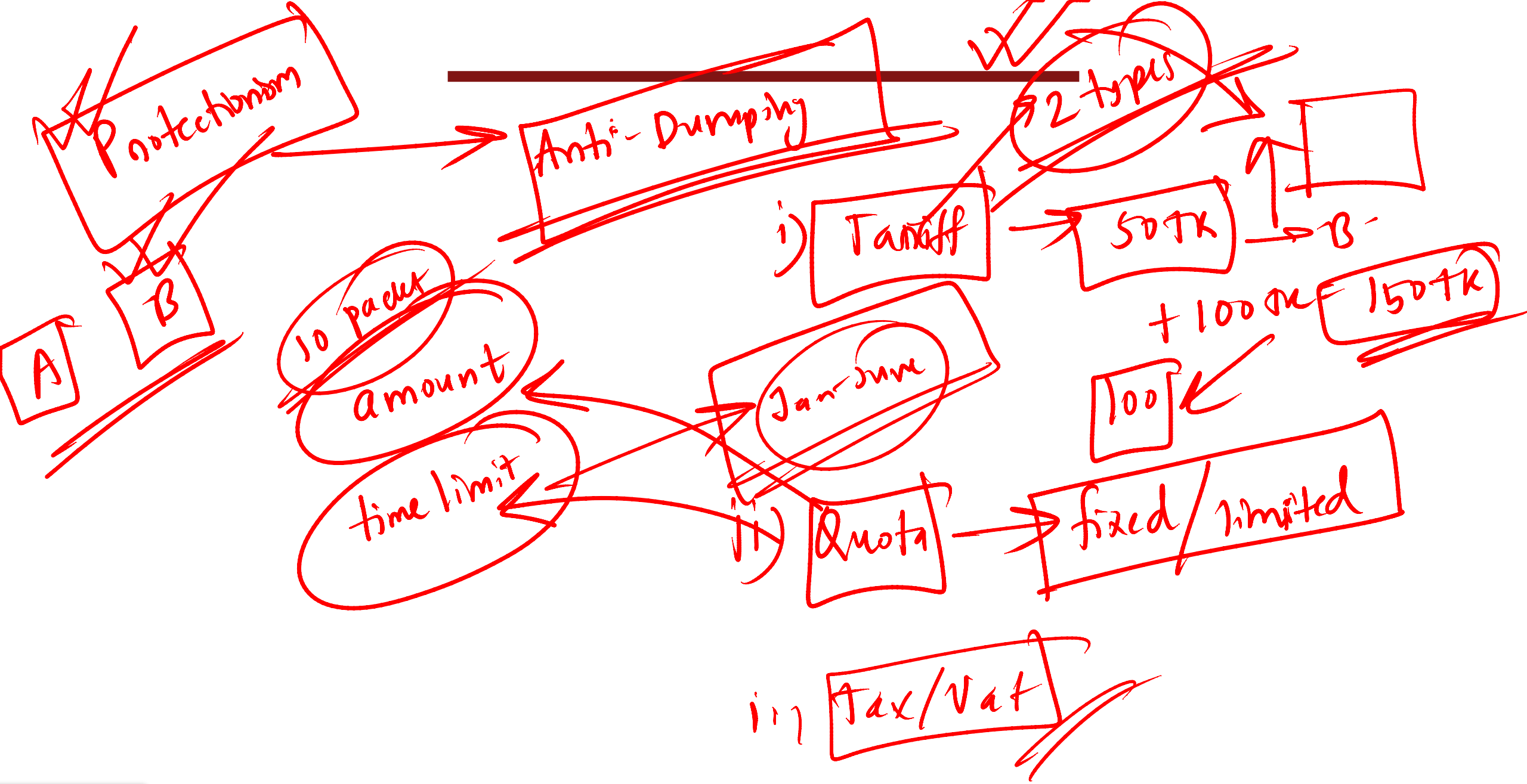

Protectionism
Anti-Dumping
2 types
i) Tariff
50Tk
B
+100Tk
150Tk
100
ii) Quota
fixed/limited
Jan-June
amount
10 packet
time limit
iii) Tax/Vat
A
B

GSP Plus:
i) 27টি শর্ত
মানবাধিকার
শ্রমাধিকার
ii) EU - শুল্ক
আমদানি বেশি
রপ্তানি বেশি
10%
Rules of Origin
Import
A
B
Rule
75%
আমদানি কম

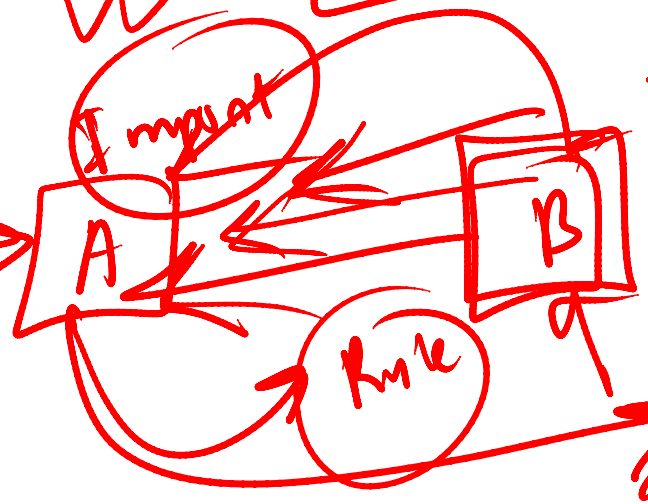

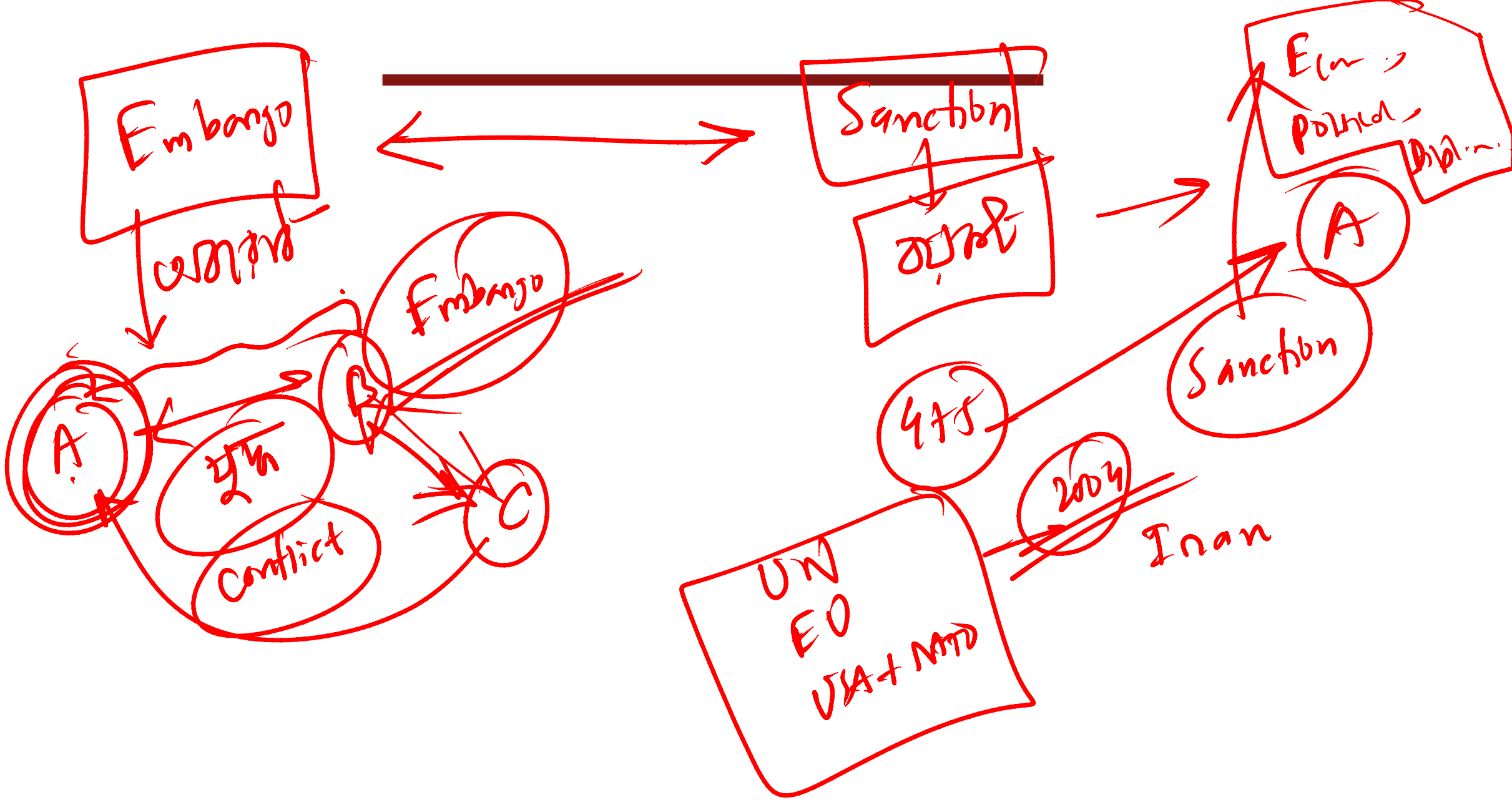

Embargo
Sanction
Embargo
A
B
C
Conflict
UN
USA + NATO
2004
Iran
Sanction
A

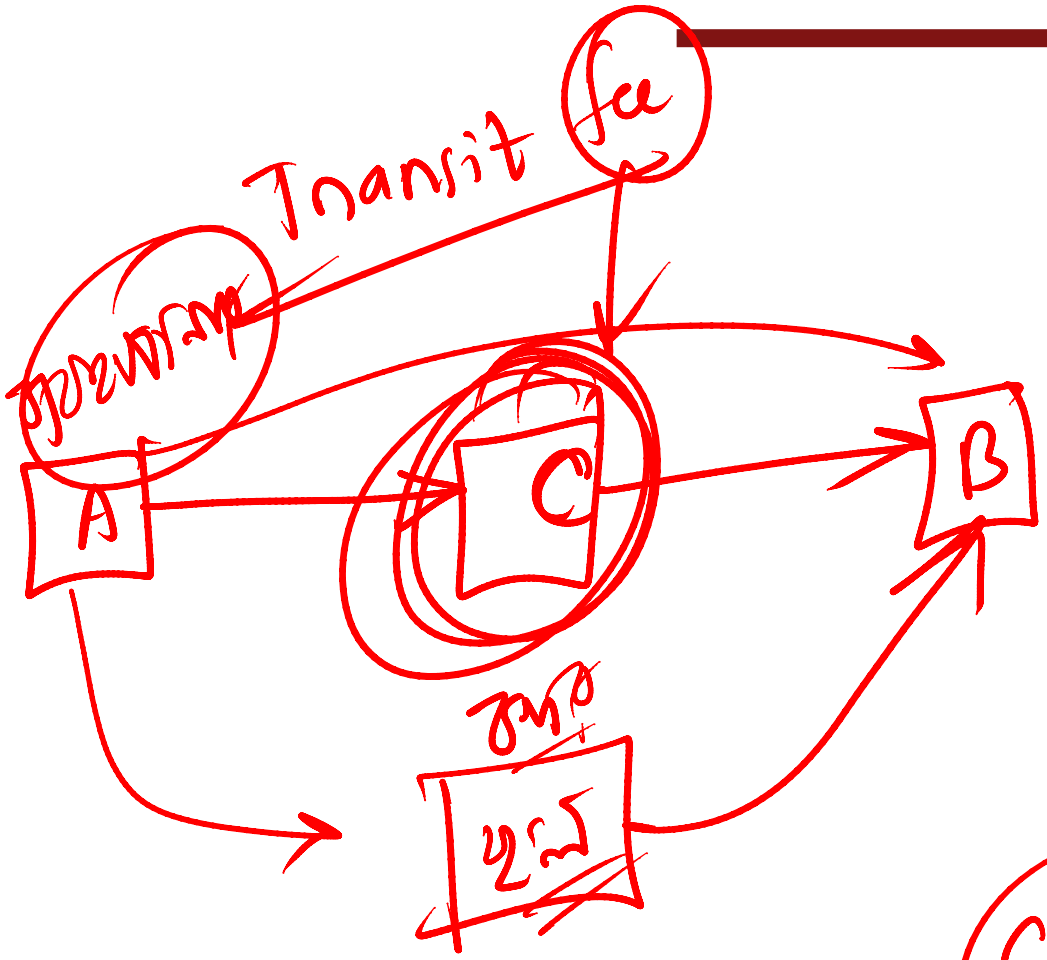
Transit
Sea
A
C
B

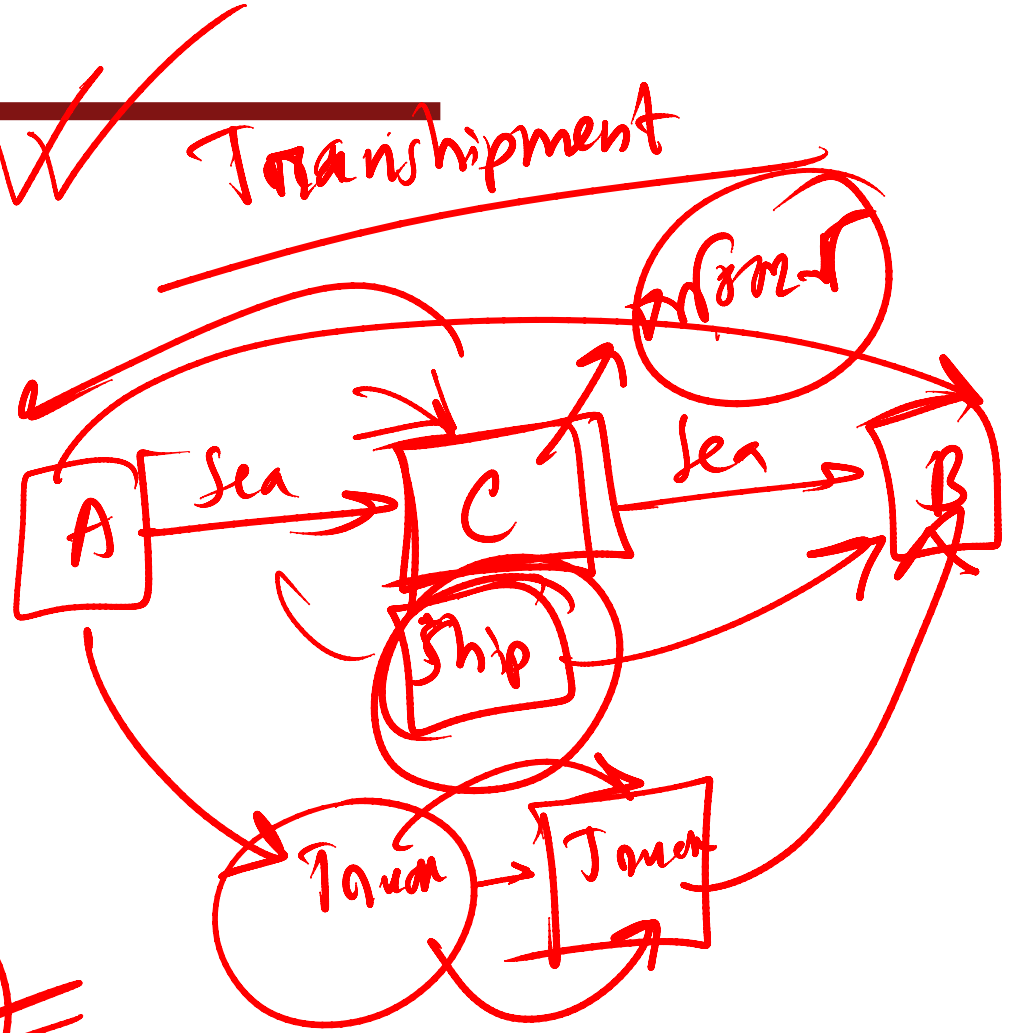
Transhipment
A
Sea
C
Sea
B
Ship

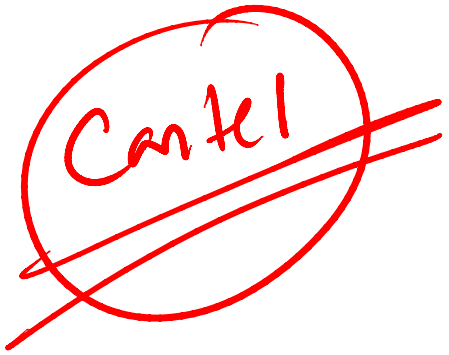
Cartel

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধাসমূহ

- **আর্ন্তজাতিক বিশেষায়ন:** একটি দেশ অন্য দেশের তুলনায় কম খরচে যে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেসব পণ্য উৎপাদন করা উচিত এবং এসব পণ্য বিনিময় করে যেসব পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি সেসব পণ্য আমদানি করা উচিত। এভাবে বিশেষায়নের ফলে প্রত্যেক দেশ তার সীমিত সম্পদ থেকে বেশি পরিমাণে আয় লাভ করতে সক্ষম হয়।
- **অবাধ বাণিজ্য ও দক্ষতা:** বাণিজ্যে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা দক্ষতার ক্ষতি করে। আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করলে ভোক্তাদেরকে বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি ভোগ করতে হয়। আবার পণ্যটি উৎপাদনে এই দেশের তুলনামূলক অসুবিধা থাকায় এটি উৎপাদনে বিদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার হয়। অবাধ বাণিজ্য এসব ক্ষতি দূর করে এবং জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে।
- **পূর্ণ প্রতিযোগিতা:** মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। আর প্রতিযোগিতা থাকার কারণে ভোক্তা কম মূল্যে গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য ক্রয় করতে পারে।
- **রাজনৈতিক যুক্তি:** কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে শুল্ক ও রপ্তানি ভর্তুকি জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সংরক্ষণ ও ভর্তুকি যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত, বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তৎপরতার জন্য সরকার সেসব ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার করতে পারে না। এজন্য সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী চাপ দিয়ে সরকারের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা আদায় করতে না পারে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## মুক্তবাজার অর্থনীতির অসুবিধা

- **বাণিজ্য শর্ত:** অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ না করে কাম্য শুল্ক ও রপ্তানি কর আরোপ করে একটি দেশ তার বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে সক্ষম হয়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এ যুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ছোট দেশসমূহ তাদের আমদানি ও রপ্তানির দাম প্রভাবিত করতে পারে না ফলে শুল্ক বা অন্যান্য নীতির মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে পারে না।
- **দেশীয় বাজার ব্যর্থতা:** যদি কোনো দেশীয় বাজার যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করা অর্থনীতির জন্য সঠিক কল্যাণকর হতে পারে। যেমন-শ্রম বাজারে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক বা রাজস্ব নীতি নেয়া যায়।
- **অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে যুক্তি:** অবাধ বাণিজ্য অনুন্নত দেশের শিল্পায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, এসব দেশের নতুন শিল্প উন্নত দেশের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এজন্য শিল্পকে সংরক্ষণ করা উচিত।

অনেকের মতে বর্তমান আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নত বিশ্বের সম্পদের কারণে অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য বিদ্যমান। এসব কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য অনবরত দেশসমূহের অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## অর্থনৈতিক উদারীকরণ

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে বোঝায় যেখানে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন না। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করাই হলো অর্থনৈতিক উদারতাবাদ। এটি সংরক্ষণবাদের বিপরীত ধারণা। সহজ ভাষায় বললে, ব্রিটেনের ব্রেক্সিট হওয়ার আগের অবস্থান ছিল অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর ব্রেক্সিটের পরে হলো সংরক্ষণবাদ।

## অর্থনৈতিক উদারীকরণের বৈশিষ্ট্য

১. এখানে আর্থিক ইনোভেশন হিসেবে সাবপ্রাইম মর্টগেজ ঋণ চালু করা হয়। ফলে অধিক ঋণ ও প্রবৃদ্ধি দ্রুত নিশ্চিত করা যায়।

২. সরকারি বাধা-নিষেধ থাকে না ফলে বেসরকারি উদ্যোগ প্রস্ফুটিত হয়। এই মতবাদ ক্লাসিক্যাল উদারনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ অপসারণ; যা নব্য উদারনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

উদাহরণ: শিল্পোন্নত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে দেখা যায়।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## অর্থনৈতিক উদারীকরণের শর্ত

| | | |
|---|---|---|
| ১. পূর্ণ বেসরকারিকরণ;<br>২. শ্রমবাজার উন্মুক্ত থাকা; | ৩. নিম্ন কর হার;<br>৪. দেশি-বিদেশি পুঁজির কম সীমাবদ্ধতা; | ৫. মুক্তবাজার বিদ্যমান থাকা; |

## সাম্প্রতিক প্রবণতা

চীন, বাংলাদেশ, ভারত, ব্রাজিলসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এটিকে গ্রহণ করেই এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্প্রতি উদারনীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য। ফলে এটিকে খারাপ বলার কোনো অবকাশ নেই।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## সংরক্ষণবাদ (Protectionalism)

### ➢ সংরক্ষণবাদের উপাদান

যে সকল পন্থায় সংরক্ষণবাদ প্রয়োগ করা হয়

✓ শুল্ক আরোপ ✓ কর আরোপ ✓ কোটা আরোপ ✓ বিধি-নিষেধ আরোপ প্রভৃতি।

### সংরক্ষণবাদের উদ্দেশ্য

✓ বিদেশি রাষ্ট্রের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ
✓ দেশি শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠান রক্ষা

১৯৬০ সালে উত্তরের ধনী দেশগুলো দক্ষিণের উপর এই অস্ত্র ব্যবহার করে। ফলে তারা ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হন যা তাদেরকে প্রদত্ত সাহায্যের ৪০ গুণ বেশি।

সংরক্ষণবাদ এমন একটি ধারণা যা মুক্তবাজার নীতির ধারণার বিপরীত এবং এটি পুজিঁবাদী ধারণাকে নিরুৎসাহিত করে। যদিও সমাজতন্ত্রের সাথে এটি মিলে যায় তবে বর্তমানে ধনী দেশগুলো এই নীতি প্রয়োগ করছে। যেমন – ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক চীনা পণ্যে অতিরিক্ত কর বসানো সংরক্ষণবাদের উদাহরণ।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## ডাম্পিং ও অ্যান্টি ডাম্পিং

কোনো দেশ দেশীয় বাজারের চেয়ে কম দামে পণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করলে অর্থনীতির ভাষায় তাকে ডাম্পিং বলে।

অপরদিকে আমদানিকারক দেশ নিজের দেশের শিল্প কারখানা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ডাম্পিং প্রতিরোধের জন্য ঐ আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে, তাকে অ্যান্টি ডাম্পিং বলে।
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী কোনো দেশের সরকার যদি মনে করে তার নিজের দেশের শিল্প কারখানা হুমকির সম্মুখীন তাহলে ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে ঐ দেশের সরকারকে দেখাতে হবে অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে কত কম দামে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এবং তা কীভাবে অভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজ্যকে ক্ষতি করছে।

যেমন: আমাদের একটা পণ্যের দেশীয় বাজারে দাম ৫০ টাকা। কিন্তু ভারতের বাজার ধরার জন্য সেটা রপ্তানি করা হলো ৪০ টাকায় এটাকে ডাম্পিং বলে। এক্ষেত্রে ভারতের সরকার তদন্ত করে এর সত্যতা পেলে নতুন করে ঐ পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে। একে অ্যান্টি ডাম্পিং বলে।

## কোটা (Quota)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো দেশ কর্তৃক আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ বা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়াকে বলা হয় কোটা। বাণিজ্যে কোটা নিম্নোক্ত ৩টি ভাবে হতে পারে –

১. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে পণ্যের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া।

২. বৈদেশিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া।

৩. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া।

ধরা যাক, বাংলাদেশ চীন থেকে চশমা আমদানি করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি চীনকে চশমার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়, অথবা বলা হয় যে ১০ লাখের বেশি চশমা বাংলাদেশ কিনবে না, অথবা অন্য কোনো শর্ত দিয়ে আমদানি সীমা নির্ধারণ করে দেয় তাহলে তা হবে কোটা।

✓ অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন, 'Quotas are essentially devices for protecting domestic producers and conserving foreign exchange.' অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের একটি বিশেষ কৌশল হলো কোটা ব্যবস্থা।

## আন্তর্জাতিক কার্টেল (International Cartel)

কিছু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যৌথভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংঘবদ্ধ হলে সেই সংঘকে কার্টেল বলে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কার্টেল গঠিত হয়। যেমন: তেল রপ্তানিকারকদের কার্টেল হলো OPEC।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কৌশলের একটি হাতিয়ার হলো কার্টেল (Cartel)। বিভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ী সংস্থা একত্র হয়ে একই ধরনের ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তখন ঐ স্বাধীন ব্যবসায়ী সংঘকে কার্টেল বলা হয়।

- **অধ্যাপক হুইটলেসির (Whittlesey) মতে,** "কার্টেল বলতে এক বা একই ধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত স্বতন্ত্র কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সংঘকে বোঝানো হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর বাজারে প্রতিযোগিতার ওপর নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা।"

আন্তর্জাতিক শিল্পের ক্ষেত্রে কার্টেলগুলো কার্যকরী হয়। কৃষি ক্ষেত্রে কার্টেলগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। শিল্পের মধ্যে আবার বৃহদায়তন শিল্পে কার্টেলগুলো অধিকতর কার্যকর।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)

**কপিরাইট, পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক** এই তিন স্বত্বকেই মেধাস্বত্ব বলা হয়। Intellectual Property Rights হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ধারককে এই ৩টি Item কে ১টি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

## TRIPS

- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) হলো মেধাস্বত্ব বিষয়ক চুক্তি। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও নকল পণ্যের বাণিজ্য প্রতিরোধ করে আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে TRIPS চুক্তি করা হয়েছে।
- WIPO মেধাস্বত্বের মর্যাদা দিলেও TRIPS মূলত নিয়ন্ত্রণ হয় WTO দ্বারা। ১৯৯৪ সালে TRIPS চুক্তি হয় এবং ১৯৯৫ সালে তা কার্যকর হয়।
- TRIPS এর অধীনে রয়েছে- Patent ও Copyright আইন।

**বৈশিষ্ট্য**

- TRIPS একটি মেধাস্বত্ব আইন।
- WTO এর সদস্য দেশগুলোর একটি বৈধ চুক্তি হলো TRIPS।
- এই চুক্তির মাধ্যমে Trade mark, Copyright, Patent ও Design সহ অন্যান্য মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা হয়।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## Rules of Origin

কোনো একটি পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করার সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানি করা পণ্য কোন দেশ থেকে এসেছে তা নির্ধারণ করেন আর এই নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিস্তারিত নিয়মকানুনকে Rules of origin বলা হয়। কোন একটি পণ্য সম্পূর্ণভাবে একটি দেশে উৎপাদিত না হয়ে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হলে সেই পণ্যের প্রকৃত উৎস নির্ধারণের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মকানুনই Rules of Origin. যেমন, তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাপড়, সুতা ও অন্যান্য উপাদান বিভিন্ন দেশ হতে সংগ্রহ করলেও মৌলিক পোশাক তৈরি হয় বাংলাদেশে। এজন্য তার রুলস অফ অরিজিন হবে বাংলাদেশ।

Rules of origin এর সাহায্যে পণ্যের উৎপত্তির দেশ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন, বিধি ও প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করে দেয় যে-

১. কোন পণ্যটি কোটার আওতায় পড়বে
২. কোন পণ্যটি শুল্কের আওতায় পড়বে
৩. কোন পণ্যটি GSP সুবিধা পাবে
৪. কোন পণ্যটি Anti-Dumping duty এর আওতায় পড়বে

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উদারীকরণ, সংরক্ষণবাদ ছাড়াও আরও এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিকই নয় বরং পরিবেশের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব বিবেচনা করে পরিচালিত হয়। এই জাতীয় অর্থব্যবস্থা নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে- গ্রিন ইকোনোমি, ব্লু ইকোনোমি।

## গ্রিন ইকোনোমি

গ্রিন ইকোনোমি বলতে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে নিম্ন কার্বন নির্গমন হবে, কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং কোন নিদির্ষ্ট সমাজের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। গ্রিন ইকোনোমিতে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যে সব খাতে  সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ করা হয় তা পরিবেশ বান্ধব, শক্তি সঞ্চায়ক এবং জীব বৈচিত্র্যের কোন সমস্যা তৈরি করে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় ভূমিকা পালন করছে গ্রিন ইকোনোমি। এর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে পণ্যের জীবনচক্র বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। গ্রিন ইকোনমি সবুজ বিপ্লব হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। নরম্যান বোরলাউগকে গ্রিন ইকোনমির জনক বলা হয়। গ্রিন ইকোনোমি ৩টি বিষয়ে কাজ করছে।

১. আঞ্চলিক, উপআঞ্চলিক এবং জাতীয় ফোরামের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান;

২. বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানে সহায়তা দেওয়া;

৩. সবুজ অর্থনীতিকে সমর্থনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলো উন্নয়ন এর মূলধারার প্রেক্ষিত পরিবর্তনে সহায়তা;

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## ব্লু ইকোনোমি

সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতিকে ব্লু ইকোনোমি বলে। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই এ মডেলের ধারণা দেন।

- বিশ্ব ব্যাংকের মতে- 'সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ও যথার্থ ব্যবহার, উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থাকে ব্লু ইকোনোমি বলা হয়।'
- ইউরোপীয় কমিশন ব্লু ইকোনোমি কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে- মহাসাগর, সাগর এবং উপকূলীয় এলাকায় সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্লু ইকোনোমি বলে।

সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনে দূষণ কমানো এবং মৎস্য আহরণের উপর চাপ কমানোর মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতিকে টেকসই করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পর্যটন, পানিদূষণ হ্রাস, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি সমুদ্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সার্বিক GDP বৃদ্ধি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনো একক দেশের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশ নিজ দেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি, জলবায়ু, ভৌগোলিক সুবিধার প্রেক্ষিতে পণ্য-সেবা উৎপাদনে বিশেষায়িত হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনে ঘটে বৈচিত্র্য, বিনিময় ও স্থাপিত হয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

একাধিক দেশ যখন নিজেদের প্রয়োজনে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য-সেবা লেনদেনের একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, International trade is the exchange of goods or resources among the countries অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সম্পদের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের ফলে শ্রমবিভাগের উপযুক্ত ব্যবহার, মূলধনের সঠিক প্রয়োগ ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন ভোগ করার সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে যেতে পারে। এভাবে ঘটে বিশ্বায়ন যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা দূরত্ব হ্রাস পায়।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য

| পার্থক্যের বিষয় | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য |
|---|---|---|
| ১. সংজ্ঞা | একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। | বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। |
| ২. ভৌগোলিক সীমা | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয় না। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয়। |
| ৩. উপাদানের গতিশীলতা | একই দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা অত্যন্ত গতিশীল হয়। | বিভিন্ন দেশের মধ্যে জলবায়ু, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা এসবের পার্থক্যের কারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সহজে গতিশীলতা লাভ করতে পারে না। |
| ৪. মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য বা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নিরূপণের প্রয়োজন হয়। |

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

| পার্থক্যের বিষয় | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য |
|---|---|---|
| ৫. সরকারি নীতি | এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো বিভিন্নতা নেই, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। | বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বিভিন্নতা রয়েছে। এরূপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু দেশ অংশগ্রহণ করে বিধায় বিভিন্ন দেশের সরকারের বিভিন্ন প্রকার নীতি ও উদ্দেশ্য বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। |
| ৬. বাণিজ্য নীতি | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন হয় না। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পৃথক বাণিজ্য নীতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক পৃথক বাণিজ্য নীতির প্রয়োজন হয়। |
| ৭. লেনদেন ভারসাম্য | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা নেই। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের সমস্যা বেশ জটিল ও চিরন্তন। এ রূপ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের সমতা স্থাপনের জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মুদ্রা সংকোচন আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। |

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

| পার্থক্যের বিষয় | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য |
|---|---|---|
| ৮. নিয়ন্ত্রণ | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম অবাধে পরিচালিত হয়। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। |
| ৯. উৎপাদন ব্যবস্থা | একই দেশের ভেতরে কারখানা আইন, শ্রম ও রাজস্বনীতি ইত্যাদি প্রায় একই রকম থাকে। | পক্ষান্তরে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয় বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। |
| ১০. পরিবহণ ও বীমা | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক কম এবং বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়। | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক অধিক এবং বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। |

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## টিকফা (TICFA)

TICFA এর পূর্ণরূপ Trade and Investment Co-Operation Framework Agreement. যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে ২০০২ সালে বাংলাদেশের সাথে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (টিফা)' করার আগ্রহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম চুক্তির প্রস্তাব পাঠায়। উভয় দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয় ২০০৩ সালে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আলোচনার পর অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি TICFA স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার। ১৭ জুন, ২০১৩ প্রস্তাবিত এ চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সালে এই চুক্তি হয়। এ TICFA চুক্তির মূল বিষয় চারটি। যেমন – ১. নিরাপত্তা, ২. পারস্পরিক বিনিয়োগ সুরক্ষা, ৩. মেধাস্বত্ব অধিকার, ৪. শ্রম হস্তান্তর নিশ্চিত করা

**এছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এ চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়।**

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## চুক্তির সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাধাসমূহ দূরীকরণ। যেমন –

১. বৃহত্তর বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যাপক রপ্তানিমুখী আয়।
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩. দু'দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে আন্তঃচুক্তি উৎসাহিতকরণ।
৪. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
৫. বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ।

বাংলাদেশের সাথে এ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমঝোতায় উন্নীত হতে পারলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমতে সমস্যাটি হলো বাংলাদেশ প্রধানত চার রকম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এগুলো হলো:

- ✓ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ফলে WTO'র মেধাস্বত্বের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে রেয়াত এর সুবিধা বাংলাদেশ লাভ করে তা থেকে বঞ্চিত হবে।
- ✓ পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত দরকষাকষির সুযোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে।
- ✓ শ্রমমান সংক্রান্ত চুক্তির কারণে রপ্তানি শিল্প হুমকির মুখে পড়বে।
- ✓ বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## GSP সুবিধা ও বাংলাদেশের শ্রম আইন

GSP এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preference। GSP একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধার নাম। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ অগ্রাধিকার পায় তাকেই বলে GSP। ১৯৭১ সাল থেকে WTO স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য GSP সুবিধা চালু করে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত হয় এবং ১৯৭৬ সাল থেকে GSP সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে LDC মুক্ত হওয়ার ঘোষণা পাওয়ায় ২০২৬ সালে LDC মুক্তির চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে। ২০২৭ সালে বাংলাদেশ GSP সুবিধা হারাবে এমনটাই ছিল শর্ত কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ২০২৯ সাল পর্যন্ত GSP সুবিধা বর্ধিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, GSP পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়। USA এং EU বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করছে তার মধ্যে অন্যতম–

১. গার্মেন্টস শিল্পের পরিবেশ ২. Trade Union ৩. শ্রমিকদের কল্যাণে করণীয়

২৭ জুন, ২০১৩ USA বাংলাদেশকে প্রদত্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করেছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করার কিছু কারণ নিম্নে দেওয়া হলো।

১. শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারা
২. সংগঠনের অধিকার না থাকা
৩. কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার অভাব
৪. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে না পারা
৫. শ্রমিকদের বীমার আওতায় আনতে ব্যর্থ
৬. পোশাক কারখানায় একের পর এক দুর্ঘটনাসহ কয়েকটি কারণে জিএসপি স্থগিত করা হয়েছে

শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা ১২ মে, ২০১৩ মন্ত্রিপরিষদে বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ আইনে –

১. শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

২. যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০০ শ্রমিক রয়েছে সেখানে জীবন বীমা বাধ্যতামূলক।

৩. গার্মেন্টস শিল্পের লভ্যাংশের ৫% শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে, এগুলো বাস্তবায়িত হলে GSP- র সুবিধা অব্যাহত রাখার বাধা কেটে যাবে।

## জিএসপি প্লাস (GSP Plus)

জিএসপি হলো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) জিএসপি সুবিধা প্রদান করে থাকে। আর WTO ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা যদি জিএসপি সুবিধা প্রদান করে তাকে GSP Plus সুবিধা বলে। তবে বর্তমানে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) জিএসপি প্লাস কর্মসূচি অনুসরণ করছে। জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

- EU ভুক্ত দেশগুলো হতে মোট আমদানির চেয়ে রপ্তানি ১০% এর কম হলে জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে।
- ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৭টি শর্ত পালনের পর জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে EU ভুক্ত দেশগুলোর মোট আমদানির ১০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ফলে এ নীতিমালার কারণে বাংলাদেশকে ইউরোপ জিএসপি প্লাসের সুবিধা দিতে পারবে না। তাই বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মতো স্বাভাবিক হারে শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

## MOST FAVOURED NATION (MFN)

Most Favoured Nation অর্থ হলো WTO এর চুক্তির অধীনে দেশগুলো তাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করতে পারবে না। কোনো সদস্যকে একটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করলে অন্য সকল সদস্যকেও একই সুবিধা প্রদান করতে হবে।

MFN অর্থ হলো যখনই একটি দেশ একটি বাণিজ্য বাঁধা কমায় বা একটি বাজার উন্মুক্ত করে তখন এটিকে তার সমস্ত বাণিজ্যিক অংশীদারদের কাছ থেকে একই পণ্য বা পরিষেবা গুলোর জন্য তা করতে হবে- ধনী, দরিদ্র, দুর্বল বা শক্তিশালী নির্বিশেষে।

উদাহরণ: ধরা যাক, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১৫% শুল্ক সুবিধা পায়। ভিয়েতনাম ও চীনও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি করে। তাহলে চীন ও ভিয়েতনামকেও বাংলাদেশের মতো ১৫% শুল্ক সুবিধা দিতে হবে।

### সুবিধা

✓ বৈষম্য হ্রাস পায়।
✓ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে।
✓ দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলো বাজার অর্থনীতিতে নিজেদের ধরে রাখতে পারে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা- (PTA)

- PTA (Preferential Trade Agreement) হলো একটি বাণিজ্যিক ব্লক যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কিছু পণ্য অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকে।
- ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ বাংলাদেশ প্রথম ভুটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ ভুটানে ১০০টি পণ্য এবং বাংলাদেশে ভুটানের ৩৪টি পণ্য শুল্কমুক্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পাবে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ Foreign Direct investment (FDI) হলো এমন এক ধরনের বিনিয়োগ, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য দেশে বিনিয়োগ করে। সাধারণত যখন বিনিয়োগকারী বিদেশে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড স্থাপন করে বিনিয়োগ করে তখন তা FDI হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ করে রাষ্ট্র আর বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করে ব্যক্তি বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান।

**সুবিধা:** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একটি দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ –

- ✓ এই বিনিয়োগ অথবা পুঁজি দরিদ্র দেশগুলোকে মূলধন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- ✓ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।
- ✓ উৎপাদনশীল সক্ষমতা বিকাশ করতে সহায়তা করে।
- ✓ প্রযুক্তির স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালনাসংক্রান্ত জ্ঞান-পদ্ধতি বৃদ্ধি পায়।
- ✓ বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে দেশীয় অর্থনীতিকে সংহত করতে সহায়তা করে থাকে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বাংলাদেশের কিছু বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সুবিধা

- ✓ ১০০ ভাগ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ;
- ✓ স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা তালিকাভুক্ত বিনিয়োগ;
- ✓ 'One stop' সার্ভিস;
- ✓ অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ; যেমন- বিদ্যুৎ খাত, তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান, টেলিযোগাযোগ, বন্দর, সড়ক ও জনপথ;
- ✓ সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ক্রয় অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা;
- ✓ বেসরকারি ইপিজেডে বিনিয়োগ। বেসরকারি উদ্যোগে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সেবা প্রদানের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড গঠন।
- ✓ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ। যেমন: ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করছে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। অতি অল্প সময়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আসলে প্রমাণ করে, নেতিবাচক রাজনীতির পরও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এ দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। নিচে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হলো–

- **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের অবকাঠামো আশানুরূপ নয় বলে বিদেশিরা সহজে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। ইতোমধ্যে অনেক দেশে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ শুরু করে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনা।
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বিশাল জনগোষ্ঠীর এই দেশে বেশিরভাগ মানুষ বেকার। বিদেশিরা তাদের কলকারখানায় সহজে কম মূল্য এই বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে।
- **কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন:** বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশের কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
- **কর অবকাশ সুবিধা প্রদান:** বিদেশিরা যাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বিদেশিরা বিনিয়োগে আশানুরূপ লাভবান হচ্ছেন।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

- **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অনেক কমে গেছে, যা বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময়।
- **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:** বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করছে সরকার। রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে।
- **ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে পর্যাপ্ত পুঁজির সঙ্গে দক্ষ ব্যবস্থাপকেরও আগমন ঘটে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সম্ভাবনাময় একটি দিক।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে নামিদামি ও দক্ষতাসম্পন্ন দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে থাকে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়, যা বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।
- **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস:** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশে সরকারি রীতিনীতি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সব ধরনের হয়রানি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- **ভাবমূর্তি উন্নয়ন:** বাংলাদেশে উন্নয়নবান্ধব, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে- এ কথা প্রমাণ করতে পারায় বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা

- **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের নিত্য অনুষঙ্গ হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, ভাঙচুর, কারখানা অগ্নিসংযোগ বাংলাদেশের স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- **উগ্রবাদ:** এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ মির্জা আজিজ বলেন, "সন্ত্রাসবাদের উত্থান বিদেশিদের বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবে। ফলে বিনিয়োগের ইচ্ছে থেকে সরে যেতে পারেন তাঁরা। তাই দেশে সুশাসন আনার পাশাপাশি সব ধরনের উগ্রবাদকে সমূলে ধ্বংস করে বিদেশিদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।"
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা:** বিদেশি কোনো সরকার বা কোম্পানির বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করে; ফলে বিনিয়োগকারী বিরক্ত হয়ে অনেক সময় বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য কোনো দেশে চলে যায়।
- **অবকাঠামোগত সমস্যা:** বাংলাদেশে বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এছাড়া যানজট, বন্দরে জাহাজীকরণে প্রচুর সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় বিদেশিরা বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেছিলেন, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বড় কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেছিলেন 'নিষ্কণ্টক জমি পাওয়া, বিশেষ করে এখন গ্যাসের সংযোগের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারা- এসব রয়েছে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ।'
- **অদক্ষ শ্রমিক:** অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও শিক্ষার নিম্নমানের কারণে বাংলাদেশে শ্রমশক্তি অদক্ষ থেকে যায়। এই অদক্ষ শ্রমিকের কারণেও বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হন।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

- **বাজারের সংকীর্ণতা:** বাংলাদেশ প্রায় ২০ কোটি মানুষ হলেও এদের বেশিরভাগের কোনো ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে এদেশের মানুষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম, যা অনেক বিদেশি কোম্পানিকে কলকারখানা স্থাপনে নিরুৎসাহিত করে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয়।
- **শ্রমিক অসন্তোষ:** শ্রমিক অসন্তোষ বাংলাদেশে একটি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। সামান্য বিষয়ে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসে এবং ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ শুরু করে। ফলে বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় না।
- **দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব:** বাংলাদেশের সর্বত্র দুর্নীতি একটি ভয়াবহ সমস্যা। দুর্নীতিতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিক থেকে ১২তম। সরকারি পর্যায়ে কোনো কাজ দুর্নীতি ছাড়া আশা করা যায় না। পাশাপাশি সুশাসনের অভাব বাংলাদেশের আরও একটি বড় সমস্যা। ফলে বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি:** বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি এসব লেগেই আছে। অনেক সময় বিদেশিরা এসবের শিকার হন। এতে বিদেশিরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না।
- **বাংলাদেশের ভাবমূর্তি:** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়। সে কারণে বাংলাদেশে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বৈদেশিক সাহায্য

কোনো দেশ স্বাভাবিক প্রয়োজন অথবা জরুরি প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ শর্তহীন বা শর্তযুক্তভাবে বিদেশ থেকে গ্রহণ করে, তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

বৈদেশিক সাহায্য তিন ধরনের:

- **ঋণ:** কোনো দেশ অন্যদেশ বা সংস্থার কাছ থেকে উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে ঋণ বলে।
- **মঞ্জুরি:** শর্তহীনভাবে আর্থিক বা অনার্থিক সাহায্য নিলে তাকে মঞ্জুরি বলে। এই অর্থ ফেরত দিতে হয় না।
- **বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ:** আবার বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য দেশের কোনো প্রকল্পের জন্য ব্যয় করলে তাকে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে।

## বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার উৎস

একটি দেশ বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদান পেয়ে থাকে:

- ✓ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে; যেমন- জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, সৌদি আরব ইত্যাদি।
- ✓ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে; যেমন- IMF, WB, ADB, AIIB ইত্যাদি।
- ✓ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত এজেন্সি UNICEF, FAO, UNDP, UNESCO, WHO, ITU ইত্যাদি।
- ✓ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন; যেমন- OPEC

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## ঋণ সংকট (Debt Crisis)

ঋণ সংকট এমন এক পরিস্থিতি যখন কোনো দেশ তার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ঋণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ ঋণ সংকটে পড়েছিল। ঐ সময় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর মেক্সিকোর মতো দেশগুলো উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো এবং তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে সময় বিশ্বব্যাংক, IMF সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণ দিয়েছিল। কিন্তু দেশগুলো এই ব্যাপক ঋণের চাপ সামলাতে না পেরে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। এরপর ৯০ এর দশকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও ঋণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ২০০৯-১০ সালে গ্রিস ঋণ সংকটের  সম্মুখীন হয়। গ্রিসের ঋণ সংকট পুরো ইউরোপকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল বলে একে ইউরোজোন ঋণ সংকটও বলা হয়।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## ঋণ সংকটের কারণ

- ✓ বাণিজ্য ঘাটতি
- ✓ অস্থিতিশীল অর্থব্যবস্থা
- ✓ অবকাঠামোগত দুর্বলতা
- ✓ অনুৎপাদন খাতে বিনিয়োগ
- ✓ অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা
- ✓ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে অপারগতা প্রভৃতি

## সংকট সমাধানে করণীয়

- ✓ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা
- ✓ অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার করা
- ✓ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা
- ✓ অবকাঠামোগত দুর্বলতা রোধ করা
- ✓ বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা
- ✓ শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহণের সময় সঠিক বিশ্লেষণ করা
- ✓ WB, IMF এর উচিত ঋণ প্রদানে যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## North-South Gap

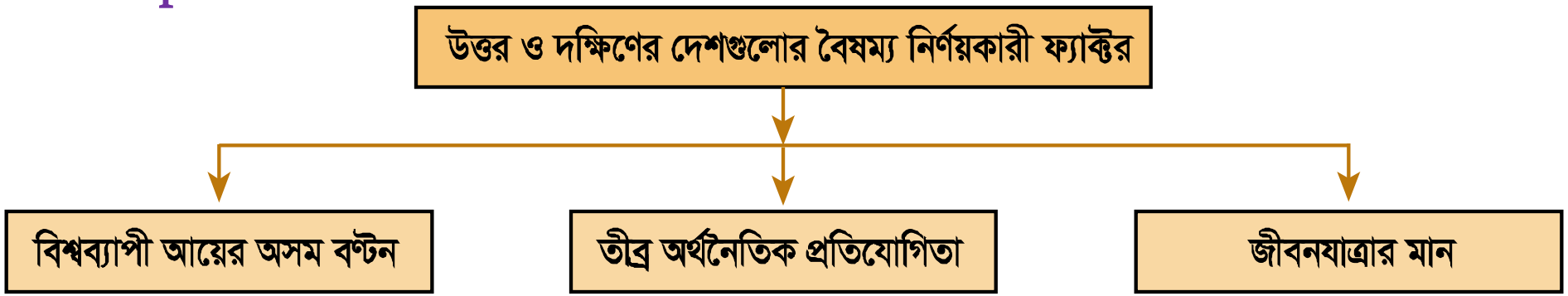


### বিশ্বব্যাপী আয়ের অসম বণ্টনের কারণসমূহ

- ✓ বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উত্তরের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিল্প কাঠামোর সাথে দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলো টিকে থাকতে পারছে না।
- ✓ তুলনামূলক ভালো আয় ও জীবনযাপনের আশায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল গোষ্ঠীর জনশক্তির একটি বড় অংশ দেশান্তরিত হচ্ছে। ফলে সমৃদ্ধ মেধা ও দক্ষ কারিগরি শক্তির একটি বড় অংশ স্থানান্তরিত হচ্ছে উন্নত বিশ্বে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণসমূহ

- ✓ উত্তরের দেশগুলোতে রয়েছে অবকাঠামোগত সুবিধা যা উৎপাদন এবং বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে। দুর্বল ও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।
- ✓ স্থিতিশীল বৃহৎ অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ফলে উত্তরের দেশগুলো দক্ষিণের অস্থিতিশীল ও উন্নয়নশীল দেশ হতে বহুদূর অগ্রসর।
- ✓ উত্তরের দেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বয়হীনতা; অরাজকতা, দুর্নীতি এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান।

## জীবনযাত্রার মানে ভিন্নতার কারণ

- ✓ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একই বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ঋণের বোঝা বহন করতে হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে। ধনী দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের সুদ দেয় শতকরা ৪ ভাগ, দরিদ্র দেশগুলো সুদ দেয় ১৭ ভাগ। বিংশ শতাব্দীর শেষে এ দুই প্রকার দেশগুলোতে জিএনপি'র অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ৮৬:১। অসম বাণিজ্য ও সীমিত সুযোগের কারণে গরিব দেশগুলো বছরে অন্তত ৫০ হাজার কোটি ডলার লোকসান দেয়।
- ✓ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি নিম্ন জীবনমানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ। ধনী দেশগুলো উদ্বৃত্ত শস্য পানির দামে বিশ্ববাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে গরীব দেশগুলোর ভর্তুকিহীন কৃষকদের পক্ষে ন্যায্য দাম না পেয়ে তাদের খরচ পুষিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে জীবনযাত্রার মান নিম্নেই থেকে যায়। ১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিখাতে যে পরিমাণ ভর্তুকি দিয়েছিল তার পরিমাণে নাইজেরিয়ার সমস্ত অর্থনীতির মূল্যের চেয়ে বেশি।
- ✓ নব্য উপনিবেশিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো দীর্ঘদিন যাবত সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে আসছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষিণের দেশগুলোতে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তুলনা

| পার্থক্যসমূহ | উত্তরের দেশসমূহ | দক্ষিণের দেশসমূহ |
|---|---|---|
| **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে** | বাহ্যিক হুমকি – ৯/১১, লন্ডন হামলার মতো সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম নিয়ে এ দেশগুলো উদ্বিগ্ন থাকে। | অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো কার্যক্রম নিয়ে এ দেশগুলো উদ্বিগ্ন থাকে। |
| **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে** | সস্তা শ্রম দ্বারা পরিচালিত উৎপাদনমুখী শিল্পনির্ভর অর্থনীতি। | প্রধানত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি। |
| **সামাজিক ক্ষেত্রে** | ধর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল। | উঁচু শ্রেণির দ্বারা সামাজিক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। |

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## এককথায় উন্নত ও দরিদ্র দেশসমূহের বৈষম্যের কারণসমূহ

- ✓ বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ধনীদের ১% এর উপার্জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জনের ৫৭% এর সমান।
- ✓ বাণিজ্যে ঘাটতি
- ✓ সাহায্যের ঘাটতি
- ✓ ঋণের বোঝা
- ✓ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে ব্যর্থতা
- ✓ নব্য উপনিবেশিকতা
- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- ✓ অপরিকল্পিত স্থাপনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সৃষ্ট সমস্যা।

**North-South Dialogue এর প্রয়োজনীয়তা:** North-South Gap যেভাবে কমিয়ে আনা যায় –

প্রথমত : উত্তরের দেশগুলোকে তোষণনীতির মাধ্যমে হলেও আলোচনার টেবিলে বসিয়ে তাদেরকে বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতা উপলব্ধি করাতে হবে এবং এক্ষেত্রে দক্ষিণের দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত : South South Co-operation বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

তৃতীয়ত : দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটাতে হবে এবং তাদের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে।

চতুর্থত : নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে উত্তরের দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে, দক্ষিণের দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন না হলে তারা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না।

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বৈশ্বিক দারিদ্র্য

দারিদ্র্য এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্য ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়।

Nearly half of the Worlds Populations currently lives in poverty and their income less then $2 per day. Of those living in poverty over 800 million people live in extreme poverty and surviving on less then $1.25 per day.

– United Nations.

Poverty is about not having enough money to meet basic needs including food, clothing and Shelter. Countries Typically define National poverty lines and we use the lines of a group of the poorest Countries to define the International Extreme poverty line of $1.90 Per day.

– World Bank

# আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের কারণ

- ✓ অশিক্ষা
- ✓ জনসংখ্যার চাপ
- ✓ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা
- ✓ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- ✓ সনাতন কৃষিব্যবস্থা ইত্যাদি
- ✓ বেকারত্ব

## দারিদ্র্য সমাধানের উপায়

- ✓ উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা
- ✓ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
- ✓ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- ✓ জনসংখ্যার চাপ কমানো
- ✓ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা
- ✓ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান করা
- ✓ নিরাপদ পানীয়ের ব্যবস্থা করা
- ✓ কৃষিব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা ইত্যাদি।

# MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG)

➲ ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের **৫৫তম** সাধারণ অধিবেশনের পূর্বে ৬-৮ সেপ্টেম্বর **তিনদিন ব্যাপী** জাতিসংঘ **মিলেনিয়াম** শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

| MDG Goals (৮টি) | |
|---|---|
| | **০১.** চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা |
| | **০২.** সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা |
| | **০৩.** নারী পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার |
| | **০৪.** শিশু মৃত্যু হার হ্রাস |
| | **০৫.** মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো |
| | **০৬.** HIV, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ |
| | **০৭.** টেকসই পরিবেশ |
| | **০৮.** উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব |

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নিষেধাজ্ঞা কী? ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার উপর পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দেশটির অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ব্যাকডোর কূটনীতি বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- 'ব্যাক চ্যানেল' কূটনীতি কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- টিকা কূটনীতি বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য most favoured nation বলতে কী বোঝায়? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- পৃথিবী কীভাবে সুনীল বা সমুদ্র অর্থনীতির ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফাংশনালিজম (functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- বৈশ্বিক সম্পদের (Global Commons) ধারণাটি কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

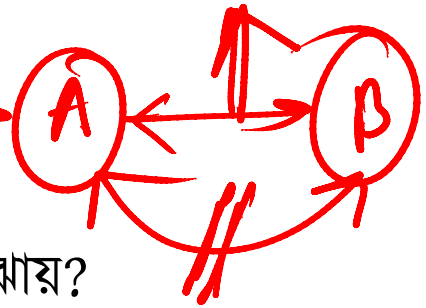

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকরণের পার্থক্য কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী (Exclusive Econimic Zone) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকা বলতে কি বোঝায়? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের বহিঃ উপাদনগুলি কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- দ্বৈত ট্র্যাক (Dual Track) কূটনীতি কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্টের সংজ্ঞা দিন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- কপিরাইট (Copyright) কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- কূটনীতিকগণ কর্মরত অবস্থায় কোন দেশে কি ধরনের সুবিধাদি ও দায়মুক্তি (Immunities) পেয়ে থাকেন? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- অর্থনৈতিক কূটনীতির সংজ্ঞা দিন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি (Driving forces of globalization) গুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ট্যারিফ ও ট্যাক্স এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন। **[৩৪তম বিসিএস লিখিত]**
- বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দা (Great Depression) কখন শুরু হয় এবং এর পিছনে কী কী কারণ ছিল? **[৩৪তম বিসিএস লিখিত]**
- "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড"- আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। **[৩৩তম বিসিএস লিখিত]**
- বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? **[৩১তম বিসিএস লিখিত]**

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

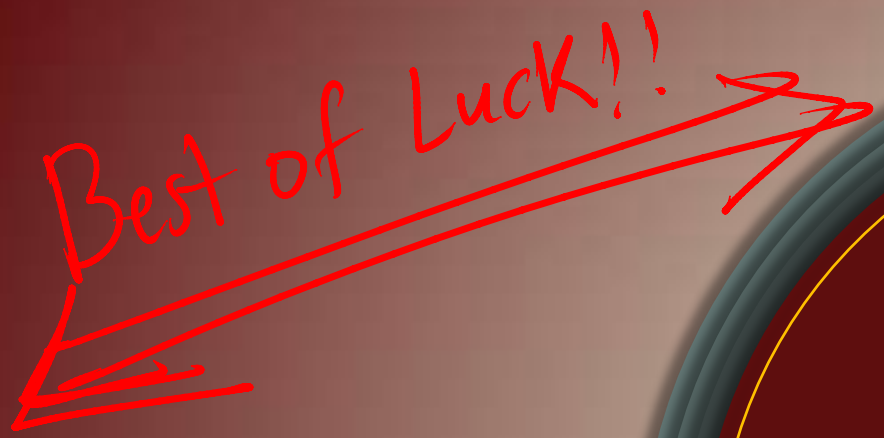


# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy